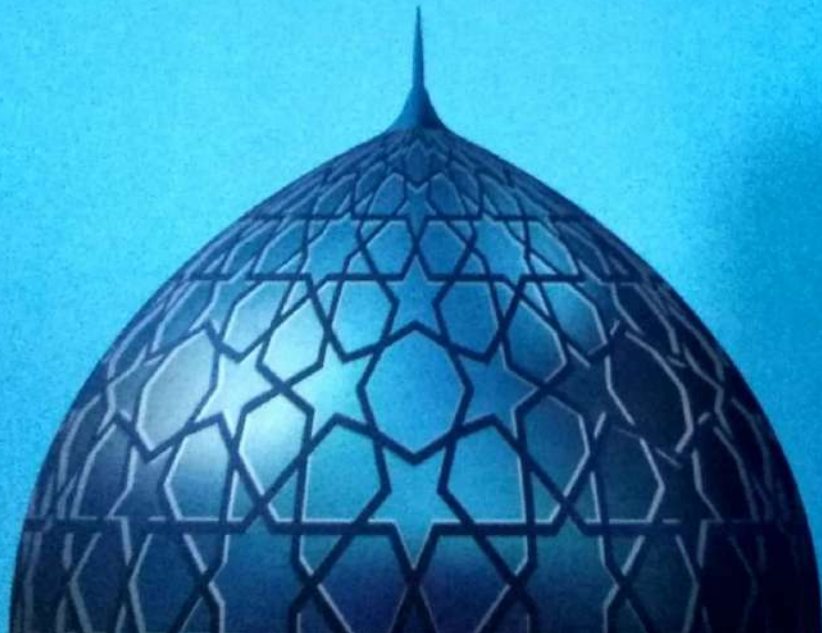


# খুশু-খুয়ু

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ



রবুল 'আলামীনের সেই সকল বান্দা-বান্দীদের জন্য যারা তাদের সালাতকে  
পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাথে তাদের সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে চায়,  
আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করতে চায়।

# সূচিপত্র

|               |    |
|---------------|----|
| প্রকাশকের কথা | ৯  |
| অনুবাদকের কথা | ১১ |

## ইমাম ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ্

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| জন্ম ও পরিচয়                            | ১৩ |
| শিক্ষা-জীবন                              | ১৪ |
| তাঁর সম্পর্কে শাইখগণের মন্তব্য           | ১৪ |
| 'উস্তাযগণের নাম                          | ১৬ |
| তাঁর হাতে-গড়া প্রসিদ্ধ কিছু ছাত্রের নাম | ১৭ |
| প্রকাশিত গ্রন্থ                          | ১৭ |

## প্রথম অধ্যায়

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| সালাত মু'মিনের জন্য আল্লাহর উপহারস্বরূপ  | ২০ |
| যমীনের সাথে অন্তরের উপমা                 | ২২ |
| অন্তর কখন শুকিয়ে যায়                   | ২৩ |
| অঙ্গসমূহের ব্যবহারে মানুষের প্রকারভেদ    | ২৪ |
| প্রত্যেকটির উপমা                         | ২৫ |
| সালাতের রহস্য                            | ২৭ |
| সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে বান্দার উদাসীনতা | ২৯ |
| ওযু সম্পর্কে কিছু কথা                    | ২৯ |
| সালাতের পূর্ণতা যখন মাসজিদে              | ৩০ |



|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| ‘আল্লাহু আকবার’ বলা একটি ‘ইবাদাত                           | ৩১ |
| ‘সানা পড়া’ একটি ‘ইবাদাত                                   | ৩১ |
| ‘আ‘উযুবিল্লাহ...’ বলা একটি ‘ইবাদাত                         | ৩২ |
| ইবনু তাইমিয়ার উপদেশ                                       | ৩৩ |
| ফাতিহা; আল্লাহ ও বান্দার কথপোকথন                           | ৩৪ |
| ‘হামদ’-এর মর্ম                                             | ৩৭ |
| ‘রব্বিল ‘আলামীন’ বলা একটি ‘ইবাদাত                          | ৩৯ |
| ‘আর-রহমানির রহীম’ বলা একটি ‘ইবাদাত                         | ৪০ |
| ‘মালিকি ইয়াউ মিন্দীন’ বলা একটি ‘ইবাদাত                    | ৪১ |
| সানা ও তামজীদের পার্থক্য                                   | ৪১ |
| ‘ইয়্যাকা না‘বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতা‘ঈন’ বলা একটি ‘ইবাদাত | ৪৩ |
| ‘ইহদিনাস সিরাতল মুসতাকীম’ বলা একটি ‘ইবাদাত                 | ৪৫ |
| আমীন ও রাফ‘উল ইয়াদাইন                                     | ৪৭ |
| রুকু‘ একটি ‘ইবাদাত                                         | ৪৮ |
| ‘কওমা’ একটি ‘ইবাদাত                                        | ৪৯ |
| ‘সিজদা’ একটি ‘ইবাদাত                                       | ৪৯ |
| সালাতের পাঁচ রুকন                                          | ৫০ |
| ‘জলসা’ (বৈঠক) একটি ‘ইবাদাত                                 | ৫৩ |
| দ্বিতীয় সিজদার মাহাত্ম্য                                  | ৫৫ |
| ‘তাশাহহুদ পাঠ’ একটি ‘ইবাদাত                                | ৫৭ |
| ‘আস্তাহিয়াতু’ (التحيات) অর্থ সম্ভাষণ                      | ৫৭ |
| আন্তয়্যিবাত                                               | ৫৯ |
| কুর‘আনের পর সর্বোত্তম বাক্য                                | ৬০ |



|                               |    |
|-------------------------------|----|
| নাবী ও সালিহীনদের প্রতি সালাম | ৬০ |
| কালিমায়ে শাহাদাতাইনের মর্ম   | ৬১ |
| নাবীর ওপর দরুদ পড়ার রহস্য    | ৬২ |
| 'আযানের সুন্নাতসমূহ           | ৬৩ |

### দ্বিতীয় অধ্যায়

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| সালাতে মনোযোগের তিনটি ধাপ                   | ৬৫ |
| সালাতের প্রতিটি কর্মে মনোযোগ বাড়ানোর উপায় | ৬৬ |
| 'ইসলাম' শব্দ নিয়ে কিছু কথা                 | ৬৮ |
| খুশু-খুযুর উপকারিতা                         | ৬৯ |
| সালাতের উপকারিতা/লক্ষ্য                     | ৭০ |

### তৃতীয় অধ্যায়

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| সালাত এবং গান-বাজনার মাঝে পার্থক্য | ৭৪ |
|------------------------------------|----|

### চতুর্থ অধ্যায়

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| সাহাবীগণ ও পরবর্তীদের বুচিবোধ | ৭৬ |
| সাহাবীগণের শ্রবণ              | ৭৭ |

### পঞ্চম অধ্যায়

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| গান-বাজনার সুন্ম্ব একটি বিষয় | ৮১ |
| অন্তরের প্রকার                | ৮৩ |



## প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

সালাত ইসলামের দ্বিতীয় রুকন। কালিমার পরেই সালাতের স্থান। একজন মানুষ 'ঈমান আনার পর তার ওপর প্রথম যা ফরয হয়ে পড়ে, তা হলো সালাত। একজন মু'মিনের জীবনে সালাত হলো ঢালস্বরূপ। এটি তাকে যাবতীয় অশ্লীল কাজ হতে বিরত রাখে। কুর'আনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন, 'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে মন্দ কাজ হতে দূরে রাখে।'

সালাত এমন একটি বর্ম—যা একজন মু'মিনকে অশ্লীলতা, পাপাচার, অনাচার থেকে দূরে রাখে। এটা এমন এক মাধ্যম যা সরাসরি আল্লাহর সাথে বান্দার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয় এবং বান্দাকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। দুনিয়ার কারও কাছেই যখন সে তার কষ্টের কথা বলতে পারে না, যখন তার আত্ননাদ-আহাজারি কেউ উপলব্ধি করতে পারে না, তখন সে সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় নিতে পারে। তার না-বলতে পারা কথা, দুঃখ-কষ্ট-বেদনা—সবকিছুই সে মহান রবের দরবারে পেশ করতে পারে। সালাত তাকে এই সুযোগটা প্রদান করে।

কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে আমাদের সালাতগুলো কেমন যেন প্রাণহীন হয়ে পড়ছে। কেউ 'সালাত' আদায় করে আবার ঘুষ, সুদ এবং ব্যভিচারেও লিপ্ত থাকে। এমনকি তাদের কারও কারও হাত থেকে অসহায় মানুষও রক্ষা পায় না। কেন? এমন তো

হওয়ার ছিল না। কথা ছিল, সালাত তাকে অশ্লীলতা, পাপাচার এবং অনাচার থেকে দূরে রাখবে। তাহলে?

মূল ব্যাপার হলো, তাদের সালাতগুলো শারীরিক ব্যায়াম ছাড়া আর কিছুই নয়; এগুলো নিছক আনুষ্ঠানিকতা ও লোকদেখানো। অন্তরের পবিত্রতা, আত্মার শুদ্ধিকরণ এবং নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা নিয়ে যতক্ষণ না বান্দা সালাত আদায় করবে, ততক্ষণ তার সেই সালাত সালাত হিসেবে গণ্য হবে না। সালাতে এইসব উপাদান বিদ্যমান থাকলেই কেবল সেটাকে খুশু-খুযুর সালাত বলা যায়।

অনেকের প্রশ্ন, ‘তাহলে খুশু-খুযুসহ সালাত আদায়ে আমাদের কী করা উচিত?’ প্রশ্নটা বহু পুরোনো। ইসলামের ইতিহাসের অনেক ইমাম, ফকীহ এবং ‘উলামা মাশাইখগণ এর উত্তর দিয়েছেন যুগে যুগে। ইসলামের অন্যতম ফকীহ, ইমাম ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ এই ব্যাপারে অত্যন্ত সাবলীল, মনোমুগ্ধকর এবং দালিলিক একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন আসরাবুস সালাহ শিরোনামে। তার সেই রচনাটি বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দিতে আমাদের এই প্রয়াস। আমরা চেষ্টা করেছি কাজটি সর্বোচ্চ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে। তবুও আমাদের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার দরুন বইয়ে ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। সহৃদয় পাঠকের চোখে যদি বইয়ে মুদ্রণজনিত, বানান বা অন্যকোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, তাহলে তা আমাদের জানানোর ব্যাপারে সবিনয় অনুরোধ করছি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এই বইয়ের রচয়িতা ইমাম ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ-কে কবুল করে নিন, এবং এই বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন, আমীন।







## অনুবাদকের কথা

ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ্ ইসলামী ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। বিশুদ্ধ আকীদা ও সাহসী চেতনায় সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। খুশু-খুযু মূলত এই মহীরুহের রচিত অনবদ্য গ্রন্থ আসরাবুস সলাত-এর অনুবাদ। প্রত্যেক মুসলিমের প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে সালাত। লেখক তার মহামূল্যবান এই বইয়ে সালাতের সেই নিগূঢ় রহস্য, সুগভীর মর্ম, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ‘মুস্তাহাব’ মনে করে যেসব বিষয় আমরা এড়িয়ে যাই, অলসতা করে যেসব সুন্নাত ছেড়ে দিই, সেগুলোকে তিনি এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন, যেন তা সাওয়াবের দিক থেকে ‘ফরয’ বিধানের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এই বইয়ে তিনি সালাত বর্জনকারী এবং খুশু-খুযু বিহীন সালাত আদায়কারীর অবস্থা বর্ণনা করেছেন। পাশাপাশি এ থেকে বেরিয়ে আসার উপায়ও বাতলে দিয়েছেন সুন্দর সুন্দর সব উপমা টেনে। বাংলাভাষীদের জন্য ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ্ রচিত এই মূল্যবান বইটি অনূদিত এবং প্রকাশিত হওয়া ছিল সময়ের দাবি।

সালাত হলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নির্দিষ্ট কিছু নড়াচড়া। এটি সালাতের দেহ; কিন্তু তাতে অন্তরকে উপস্থিত রাখা, স্রষ্টার সামনে বিনয়াবনত (খুশু-খুযু) হওয়া হলো তার প্রাণ। আমাদের সালাত কীভাবে প্রাণবন্ত করে আল্লাহর সামনে উপস্থাপন করা যায়, সেই পদ্ধতিই বার বার বিভিন্নভাবে, হরেক রকম বর্ণনার মাধ্যমে উঠে এসেছে বইটিতে। অতএব, এটি ‘ধরলাম, পড়লাম, রেখে দিলাম’ টাইপের কোনো বই না; বরং চর্চা ও অনুশীলনযোগ্য একটি বই। বলা ভালো, এটি সালাতে খুশু-খুযু তৈরির আদর্শ গাইডলাইন। মূল বইটি ‘আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

অদক্ষ অনুবাদকের ভাব ও ভাষার আলোকে এর বিচার করা নিঃসন্দেহে অবিচার হবে। অনুবাদের অঙ্গতা ও অসাবধানতার দখল তো আছেই, তবে প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতার কোনো কমতি ছিল না। বইটির অনুবাদ ও প্রকাশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন। পরিশেষে, যেহেতু এটি ‘যা-লিকাল কিতাব’ (আল-কুর’আন) নয়, তাই ‘লা-রইবা ফীহি’ (তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই) বলার দুঃসাহসও আমার নেই। যদি আমার অযোগ্যতা, অদক্ষতা ও অনভিজ্ঞতার কোনো চিহ্ন কারও চোখে পড়ে, ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে তা ধরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ রইল। এই বইয়ে যা ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে, তার দায়ভার আমার। আর যা কিছু ভালো, তার কৃতিত্ব একমাত্র আল্লাহর।

**মাসউদুর রহমান**

দাওরায়ে হাদীস,

জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া,

মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।





## ইমাম ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ্

ইমাম ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়াহ। ইসলামী দুনিয়ার এক অতুজ্জ্বল দেদীপ্যমান নক্ষত্র। ‘ইলমের এক মহা সমুদ্র। বহু বছর আগে তাঁর দৈহিক মৃত্যু হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ইসলামের জ্ঞানরাজ্যে তাঁর বিপুল অবদান তাকে সুরাইয়া তারকার মতো সমুজ্জ্বল করে রেখেছে।

### জন্ম ও পরিচয়

ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ্ ৬৯১ হিজরী সনের সফর মাসের সাত তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান সিরিয়ার দামেস্ক। তার আসল নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবু ‘আদিল্লাহ্। উপাধি শামসুদ্দীন (দ্বীনের রবি)। পিতার নাম আবু বাকর। দাদা আইয়ুব ইবনু সা‘দ। তবে তিনি ‘ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়াহ’ নামেই অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অনেকে শুধু ‘ইবনুল কায়্যিম’ বলেও সম্বোধন করে থাকেন।

এই নামে প্রসিদ্ধির কারণ হলো, তার সম্মানিত পিতা আবু বাকর বিন আইয়ুব তৎকালে দামেস্কের ‘মাদরাসাতুজ্জ জাওযিয়াহ’র অন্যতম ব্যবস্থাপক ছিলেন। দীর্ঘদিন সেখানে অধ্যাপনার কাজে নিজেই নিয়োজিত রাখেন। ফলে সেসময় তাকে ‘কায়্যিম আল-জাওযিয়াহ’ নামে ডাকা হতো। পরবর্তী সময়ে তাঁরই সন্তান মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ্ ‘ইবনু কায়্যিম আল-জাওযিয়াহ’ (কায়্যিম আল-জাওযিয়াহ’র ছেলে) নামেই অধিক পরিচিতি লাভ করেন।



## শিক্ষা-জীবন

হাফিয় ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ্ একটি দ্বীনি পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। তিনি লালিতপালিত হয়েছেন ‘ইলম ও ‘আমালের চর্চায় নিরত একটি পরিবারে। তাই ছোটবেলা থেকেই তার মাঝে ‘ইলমের প্রতি প্রচণ্ড ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। দিন দিন যেন তার জ্ঞান আহরণের পিপাসা বাড়ছিল। তিনি জ্ঞানার্জনে ব্রত হলেন। বিভিন্ন শাস্ত্র নিয়ে অধ্যয়ন শুরু করলেন। তাঁর সম্মানিত পিতাও একজন বিজ্ঞ ‘আলিম হওয়ায় উদ্দেশ্য ও বিধেয় যোলকলায় পূর্ণ হতে তাকে খুব বেশি বেগ পোহাতে হয়নি।

হাফিয় ইবনু কাসীর রাহিমাহুল্লাহ্ ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ্-র পিতার সম্পর্কে বলেন, ‘আবু বাকর বিন আইয়্যুব বিন সা‘দ আল-হাম্বলী ছিলেন শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত, নেক ও পরহেযগার ব্যক্তি। গণ্যমান্য এবং ভণিতামুক্ত একজন সাহসী মানুষ।’

পিতার কাছেই প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি। পিতাই তার প্রথম শিক্ষক। এছাড়াও তিনি ‘ইলমের জন্য তৎকালীন অনেক বিজ্ঞ ‘আলিমের শরণাপন্ন হয়েছেন।

যদি তার রচনাবলি ও সংকলন সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা হয়, তাহলে সহজেই অনুমান করা যায়, তিনি কত গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। আকীদা, ফিকহ, হাদীস, দর্শন, উসূল, তাফসীর, ভাষা, সাহিত্য, ফারাসেয ও তাসাউফসহ নানান শাস্ত্রে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য রাখতেন।

‘ইলমের পেছনে তার ব্যতিব্যস্ততা এবং বিদগ্ধ ‘আলিম হওয়া সত্ত্বেও কখনো কোনো নফল-মুস্তাহাব ‘আমালও ছুটে যেত না। তিনি মুহাক্কিক ‘আলিম হওয়ার পাশাপাশি ছিলেন বুয়ুর্গ ও যাহিদ। ‘ইলম ও ‘আমালের অপূর্ব সমন্বয়কারী এক ব্যক্তি।

## তার সম্পর্কে শাইখগণের মন্তব্য

হাফিয় ইবনু কাসীর রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন—

তিনি হাদীস শুনতেন এবং ‘ইলমের গভীরতায় হারিয়ে যেতেন। হাদীস, তাফসীর ও ফিকহের মূলনীতিতে তিনি তার সমসাময়িক সকল ‘আলিমকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। ৭১২ হিজরীতে ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ্ মিশর ছেড়ে দামেস্ক চলে

আসেন। তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ সতেরো বছর ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ তার সান্নিধ্যে ছিলেন। রাতদিন ‘ইলমের সাগরে সাঁতার কাটতেন। এভাবে ধীরে ধীরে অধ্যয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন শাস্ত্রে নিজেকে একক ও অনন্য করে গড়ে তোলেন তিনি। এভাবেই নিজেকে তিনি পরিণত করেন এক প্রস্ফুটিত গোলাপে।

হাফিয় ইবনু কাসীর রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন—

তিনি ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। দরদী ও সহনশীল। দুনিয়ার প্রতি ছিলেন নির্মোহ ও নিরাসক্ত একজন মানুষ। কারও সাথে কোনো মনোমালিন্য ছিল না। কখনো কারও গীবত কিংবা ছিদ্রাশেষণ করতেন না। কাউকে কষ্ট দিতেন না। আমি ছিলাম তার কাছে ও প্রিয়দের একজন। আমাদের যুগে আমি তার মতো ‘আবিদ গোটা বিশ্বে দ্বিতীয় আর কাউকে দেখিনি! তার সালাত ছিল দেখার মতো। রুকু’-সিজদা হতো প্রলম্বিত। কখনো সালাত এত দীর্ঘায়িত করতেন যে, সাথিরা অভিযোগ করত। তবুও তিনি তা থেকে ফেরেননি। মৃত্যু পর্যন্ত এভাবেই সালাত আদায় করে গেছেন।

হাফিয় ইবনু রজব রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

তিনি ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ-র সান্নিধ্যে থেকে ‘ইলমের সকল শাখায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। তাফসীরের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। শারী‘আতের মূলনীতি, হাদীস ও ফিকহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় অনুধাবনে কেউ তার সমপর্যায়ের ছিল না। ‘আরবী ভাষা-সাহিত্য ও তর্কশাস্ত্রে ছিল তার অবাধ বিচরণ। তাসাউফ এবং আত্মশুদ্ধির পথে তিনি ছিলেন অগ্রপথিক।

ইবনু রজব রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন—

তিনি খুব ‘ইবাদাতগুয়ার ছিলেন। সালাত অত্যাধিক পরিমাণে দীর্ঘায়িত করতেন। প্রভুভক্তি, সূম্মাতের অনুসরণ, বিনয় ও নশ্রতা, দুনিয়ার প্রতি নির্মোহতা ছিল তার চরিত্রের অনন্য ভূষণ। ‘ইবাদাতে তার সমকক্ষ আমি আর কাউকে খুঁজে পাইনি। আমি জানি, তিনি নিষ্কাপ নন; কিন্তু তার মতো নিষ্কাপও আমি আর কাউকে দেখিনি।



ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ্ ছিলেন ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ্-র শিক্ষক। ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ্-র সাথে থাকার কারণে ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ্-কেও অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হয়েছে। বাতিলের চোখরাঙানি, শাসকের হুশিয়ারির সম্মুখীন হতে হয়েছে। জেল-যুলুম তো ছিলই। তবুও কখনো তিনি ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ্-র সান্নিধ্য ছেড়ে যাননি। ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ্ দামেস্কে আসেন ৭১২ হিজরীতে। তখন থেকে ৭২৮ পর্যন্ত সতের বছর ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ্ তার সাথে ছায়ার মতো লেগে ছিলেন। আর ওই বছরই ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ্ ইনতিকাল করেন।

ইমাম শাওকানী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন—

ইলমের বিভিন্ন শাখায় তার অসামান্য দখল ছিল। সমসাময়িক সকলের মাঝে ছিলেন অতুলনীয়। উজ্জ্বল নক্ষত্র। আসলাফদের মাযহাব সম্পর্কে তিনি গভীর পাণ্ডিত্য রাখতেন। তিনি তার জীবদ্দশায় জগৎজোড়া খ্যাতি লাভ করেন।

ইমাম সুয়ুতী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন—

তিনি লেখক, সংকলক, বিতর্কিক ও বিদগ্ধ মুজতাহিদ। হাদীস, তাফসীর ও ফিকহের শাখাগত ক্ষেত্রে তাকে অনেকেই ইমামগণের সমপর্যায়ে গণ্য করে থাকেন। ইবনুল কায়্যিম-এর জ্ঞানের পরিধি সুবিস্তৃত। জ্ঞানের এই বিশালতা তিনি অর্জন করেছেন বিভিন্ন শাইখ থেকে। বিশেষত ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ্; তার থেকেই তিনি সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন।

### ’উস্তায্গণের নাম

১. শাইখুল ইসলাম আবুল ‘আব্বাস আহমদ বিন ‘আব্দুল হালীম বিন ‘আব্দুস সালাম বিন তাইমিয়া।
২. আবুল ‘আব্বাস আহমদ বিন ‘আব্দুর রাহমান বিন ‘আব্দুল মুনাইম আল হাফলী। রাহিমাহুল্লাহ্। (মৃত্যু-৬৯৭ হিজরি)



৩. ইসমাঈল মাজদুদ্দীন বিন মুহাম্মাদ আল ফাররা। রাহিমাছুল্লাহ। (মৃত্যু-৭২৯ হিজরি)
  ৪. মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন আবু 'আদিল্লাহ বিন আবিল ফাতাহ আল হাম্বলী। রাহিমাছুল্লাহ। (মৃত্যু-৭০৯ হিজরি)
  ৫. ইউসুফ জামালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ বিন যাকিউদ্দীন 'আবদুর রাহমান। রাহিমাছুল্লাহ। (মৃত্যু-৭৪২ হিজরি)
- এছাড়াও তাঁর আরও অনেক 'উস্তায্ ছিলেন।

### তাঁর হাতে-গড়া প্রসিদ্ধ কিছু ছাত্রের নাম

১. আল হাফিয আল মুফাসসির আল মাশহূর, 'ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল আবুল ফিদা বিন 'উমার বিন কাসীর আশ-শাফে'য়ী। তিনি ইবনু কাসীর নামেই অধিক প্রসিদ্ধ। রাহিমাছুল্লাহ। (মৃত্যু-৭৭৪ হিজরি)
২. 'আবদুর রাহমান যাইনুদ্দীন আবুল ফারায় ইবনু আহমদ ইবনু 'আবদুর রাহমান। তিনিই বিখ্যাত ইবনু রজব হাম্বলী। রাহিমাছুল্লাহ। (মৃত্যু-৭৯৫ হিজরি)
৩. মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন আবু 'আদিল্লাহ বিন আহমাদ বিন 'আব্দুল হাদি। রাহিমাছুল্লাহ। (মৃত্যু-৭৪৪ হিজরি)

### প্রকাশিত গ্রন্থ

তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। সংকলন করেছেন অনেক বড় বড় কিতাব। তার চিন্তার দূরদর্শিতা এবং জ্ঞানের গভীরতা ফুটে ওঠে তার লিখনীতে। এমনকি যুগযুগ ধরে তা পরবর্তীদের জন্য পাথেয় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। শাইখ জালিল বাকর আবু যায়দ রাহিমাছুল্লাহ ইবনুল কায়্যিম রাহিমাছুল্লাহ-র গ্রন্থাবলির একটি তালিকা করেছেন, যার সংখ্যা ৯৬ ছাড়িয়ে! তন্মধ্যে প্রকাশিত প্রসিদ্ধ কিছু কিতাবের নাম :

১. যাদুল মা'আদ (চার খণ্ড)
২. তাহযীব সুনানে আবি দাউদ ওয়া ইয়াহু মুশকিলাতিহি।

৩. সফরুল হিজরাতাইন।
৪. মারাহিলুস সাযিরীন।
৫. আল কালিমুত তাইয়্যিব।
৬. যাদুল মুসাফিরীন।
৭. নকদিল মানকুল।
৮. ই'লামুল মু'কীয়ীন 'আন রব্বিল 'আলামীন (তিন খণ্ড)।
৯. বাদায়িল ফাওয়ায়িদ (দুই খণ্ড)।
১০. আস সাওয়ায়িকুল মুরসালা।
১১. হাদীউল আরওয়াহ ইলা বিলাদিল আফরাহ।
১২. নুযহাতুল মুশতাকীন।
১৩. আদাউ ওয়াদাওয়া।
১৪. মিস্তাহু দারিস সা'আদাহ (একটি বিশাল গ্রন্থ)।
১৫. গরীবুল উসলুব।
১৬. ইজতিমা'উ জুযুশিল ইসলামিয়া।
১৭. কিতাবুত তুরুকিল হিকমাহ।
১৮. 'ইদাতুস সাবিরীন।
১৯. ইগাসাতুল লাহিফান।
২০. আত তিবয়ান ফী আকসামিল কুর'আন।
২১. কিতাবুর রুহ।
২২. আসসিরাতুল মুসতাকীম।

২৩. আল ফাতহুল কুদসী।
২৪. আততুহফাতুল মাকীয়াহ।
২৫. আল ফাতাওয়া, ইত্যাদি।
২৬. জাম'উল ইফহাম।
২৭. আসরাবুস সলাহ।
২৮. রওজাতুল মুহিব্বীন ও নুযহাতুল মুসতাকীন।
২৯. আহকামু আহলিয় যিম্মী।
৩০. জালাউল আফহামি ফিসসালাতি ওসসালামু আ'লা খাইরিল আনামী।
৩১. আহকামুল মাউলুদ।
৩২. আল জাওয়াবুল কাফি লিমান সাআলা আন দাওয়া ইশশাফী।
৩৩. হুকমু তারিকিস সালাহ
৩৪. আসসাওয়া'ইকুল মুরসালাতু 'আলাল জাহমিয়াতি।
৩৫. আততুরুকুল হিকমিয়াহ ফি সিয়াসাতিল ইসলামিয়াহ।
৩৬. মিতাতুল দারিস সা'আদাহ।

মুসলিম উম্মাহর এই অতন্দ্র প্রহরী জীবনভর ইসলামের অনেক খেদমত করেছেন। নিজের চিন্তা-চেতনা, বিবেক-বুদ্ধি, জ্ঞান ও 'ইলমের কাছে পরবর্তীদের চির ঋণী করে রেখেছেন। এই দীপ্তিমান প্রদীপটি যাট বছর বয়সে ৭৫১ হিজরীর ১৩ই রজব বুধবার দিবাগত রাতে 'ঈশার' আযানের সময় চিরদিনের জন্য নিভে যায়। পরদিন যুহরের সালাতের পর তার জানাযা অনুষ্ঠিত হয়—যা তৎকালীন সর্ববৃহৎ জানাযা। দামেস্কের 'আল বাবুস সগীর' নামক কবরস্থানে পিতার পাশে আজও তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত। আল্লাহ তাঁর কবরকে নূরে ভরে দিন। এবং জান্নাতের উঁচু মাকাম নসীব করুন।





## প্রথম অধ্যায়

এই আলোচনা হচ্ছে গান এবং মিউজিক শোনার প্রবণতার বিপরীতে সালাত এবং কুর'আনের প্রতি ভালোবাসা সম্পর্কে; কুর'আন এবং সালাত থেকে প্রাপ্ত অনুভূতি কেন মিউজিক এবং গানের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, এখানে সে বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হবে। এছাড়াও এখানে আলোকপাত করা হবে এই দুই চাহিদার মধ্যে বিরাজমান বিপরীতমুখী সম্পর্কের ব্যাপারে, এবং কীভাবে একটির প্রভাব অবধারিতভাবে অন্যটিকে দুর্বল ও অকার্যকর করে দেয়; এখানে সে ব্যাপারে আলোকপাত করা হবে। কেননা, মিউজিক এবং গানের প্রতি আকর্ষণ যত তীব্র হয়, সালাত (এবং কুর'আনের) প্রতি ভালোবাসা ততই দুর্বল হয়ে পড়ে।

### সালাত ইবাদাতকারীদের চোখের শীতলতা এবং মু'মিনের জন্য আল্লাহর উপহারস্বরূপ

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর ইবনুল কায়্যিম আল-জাওয়িয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আপনার জানা আবশ্যিক যে, সালাত হচ্ছে নিঃসন্দেহে আন্তরিক 'ইবাদাতকারীদের (মুহিব্বীন) জন্য প্রশান্তির আবাসস্থল, একেশ্বরবাদীদের (মুওয়াহিদ্দীনদের) জন্য আত্মার তৃপ্তি, 'ইবাদাতকারীদের (আবিদীন) জন্য বাগান, বিনয়ীদের (খাশি'য়ীন) জন্য আনন্দের নির্যাস, খাঁটি লোকদের (সাদিকীন) জন্য পরীক্ষা, এবং সঠিক পথের যাত্রীদের জন্য উপযুক্ততা যাচাইয়ের মানদণ্ড।

সালাত আল্লাহর পক্ষ থেকে মু'মিনের জন্য উপহার। তিনি তাদের সালাতের দিকে আহ্বান করেন। তাদের অন্তর সালাত দ্বারা পরিশুদ্ধ করেন। তিনি এই বারকাতময় উপটোকন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে তাদের নিকট অর্পণ করেছেন। সালাত তাদের জন্য রাহমাত, যাতে তারা এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হতে পারে। সর্বোচ্চ সফলতা ও নৈকট্য অর্জন করতে পারে। এতে আল্লাহর কোনো চাওয়া নেই; বরং এই সালাত আল্লাহর পক্ষ থেকে মু'মিনদের জন্য দয়া, সুবিশাল অনুগ্রহ। সালাতকে তিনি মু'মিনদের অন্তর এবং অঙ্গাসমূহের 'ইবাদাত হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

তিনি মু'মিনদের জন্য সালাতকে এমন এক মাধ্যম বানিয়েছেন, যার দ্বারা মু'মিন আল্লাহ্ ব্যতীত সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে, একমাত্র আল্লাহর দিকে ধাবিত হতে পারে। তার নৈকট্যলাভে ধন্য হয়ে, ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে, তার সামনে দাঁড়ানোর স্বাদ উপভোগ করতে পারে এবং একজন দাস হিসাবে দাসত্বের যত আদেশ-নিষেধ রয়েছে তা যথাযথভাবে পূরণের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সম্মান ও সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারে। এভাবে একজন বান্দা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে এবং আল্লাহ তাকে ভালোবাসতে শুরু করেন।

যেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর বান্দাকে কামনা, প্রবৃত্তি ও বাহ্যিক উপায়-উপকরণ দিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন, তাই তিনি এর পাশাপাশি দয়া ও অনুগ্রহস্বরূপ তার জন্য এমন এক 'দস্তরখানের<sup>১</sup>' ব্যবস্থা করে রেখেছেন, যা সকল প্রকার খাবারে পরিপূর্ণ, স্বাদে ভরপুর; এবং যা রঙ-বেরঙের পানীয়, উপহার-উপটোকনসমৃদ্ধ। তিনি প্রতিদিন পাঁচবার সেই সমৃদ্ধ 'দস্তরখানে' তাকে ডাকেন, কোমল সুরে আহ্বান করেন এমন অনুগ্রহের প্রতি—যা সুস্বাদু, পুষ্টিকর ও রুচিবর্ধক। কোনোকিছুর সাথে যে দস্তরখানের তুলনা চলে না। তিনি এ জন্যই এমন দস্তরখানের ব্যবস্থা করেছেন—যেন বান্দা 'ইবাদাতের পরিপূর্ণ স্বাদ আস্বাদন করতে পারে। সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী হতে পারে, এবং তার এই সালাত যেন তার গুনাহর (সাগিরা) কাফফারা হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা সালাত আদায়কারীকে এক বিশেষ প্রকার নূর দান করেন। নিশ্চয় সালাত একটি নূর। অন্তর ও অঙ্গাসমূহের শক্তি। রিয়ক প্রশস্ততার কারণ। ফেরেশতাগণ সালাত আদায়কারীকে দেখে আনন্দিত হন। যমীনের অধিবাসী, পাহাড়, বৃক্ষরাজি, সাগর-নদী—সবকিছু সালাত আদায়কারীকে নিয়ে গর্ব

১ 'দস্তরখান' একটি ফারসী শব্দ। যে পাত্রে খাবার রেখে খাওয়া হয় সেটাই দস্তরখান।



করে। কিয়ামাতের দিন এসব তার জন্য বিশেষ নূর ও সাওয়াব হিসেবে দেখা দেবে।

এই দস্তরখানে (সালাতে) আসার পূর্বে বান্দা থাকে ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত। দুর্ভিক্ষপীড়িত ও খরাক্রান্ত। সালাতে মনোনিবেশের পূর্বে সে থাকে বস্ত্রহীন এবং অসুস্থ। অতঃপর যখন সে (সালাত আদায় করার পর) দস্তরখান থেকে বেরিয়ে আসে, তখন সে তৃপ্ত, পরিতৃপ্ত, সুস্থ ও সম্মানের পোশাকে আচ্ছাদিত (অবস্থায় আসে)। তখন তার মানসিক অবস্থা এমন হয়, যেন তার সকল ইচ্ছে ও চাওয়া আল্লাহ পূর্ণ করে দিয়েছেন।

### যমীনের সাথে অন্তরের উপমা

বান্দার অন্তরের ওপর শুষ্কতা ও রুক্ষতা (উদাসীনতা ও আলস্য) ধারাবাহিকভাবে আসতেই থাকে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে প্রতি মুহূর্তে দস্তরখানের দিকে নতুনভাবে আহ্বান করতে থাকেন।

যেহেতু কাঠিন্য ও খরায় আক্রান্ত অন্তর সর্বদা আল্লাহর রাহমাত বর্ষণের মুখাপেক্ষী, তাই তৃষ্ণার্ত হৃদয় শুধু এ বর্ষণের দিকেই ব্যাকুল নয়নে তাকিয়ে থাকে—যাতে 'ঈমানের গাছপালা এবং ইহসানের শস্য শুকিয়ে না যায়। অন্তর ও আত্মার উর্বর ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে না পড়ে। সেজন্য সে রাহমাতের মেঘ থেকে বৃষ্টি চায়। কখনো সে তার প্রতিপালকের কাছে অন্তরের এমন অবস্থার জন্য অভিযোগ পেশ করে মুক্তি কামনা করে এবং পানির প্রয়োজনের কথা বিনয়ের সাথে উপস্থাপন করে।

যতক্ষণ বান্দা আল্লাহর যিক্রে (স্মরণে) মগ্ন থাকে এবং তার মনোনিবেশ কেবল আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তার ওপর মুঘলধারে রাহমাতের বৃষ্টি বর্ষিত হয়। আর যখন সে উদাসীন হয়ে পড়ে, তার অবহেলার অনুপাতে রুক্ষতা এবং কাঠিন্য তাকে পেয়ে বসে।

হৃদয়ের খরা ও শুষ্কতা হলো উদাসীনতা, 'ইবাদাতের প্রতি অনীহা। যখন মালিকের সান্নিধ্যলাভের প্রতি তার এ অবহেলা ও উদাসীনতা প্রবল হয়ে ওঠে—তার হৃদয়ে খরা দেখা দেয়। উদ্ভিদ ও শস্যগুলো শুকিয়ে যায়। প্রবৃত্তির আগুন তাকে চারদিক থেকে জ্বালাতে থাকে। ফলে, বিভিন্ন ফল ও ফসল উৎপন্ন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা অনুর্বর ভূমিতে পরিণত হয়। এরপর কখনো যদি তাতে রাহমাতের বর্ষণ নামে,



‘ইমান ও ‘আমালের সেই মরা ভূমি পুনরায় প্রাণ ফিরে পায়। নতুন করে উদ্ভিদ গজায়। চারদিক সুশোভিত হয়।

শুষ্ক, শক্ত ও খরাক্রান্ত হৃদয়ের দৃষ্টান্ত হলো এমন বৃক্ষের মতো, যার সতেজতা, সজীবতা, ফলদান ও বেঁচে থাকা নির্ভর করে পানির ওপর। যদি তাতে পানি না দেওয়া হয়, তাহলে তার শিকড়গুলো শুকিয়ে যাবে। মূল ও কাণ্ড রসশূন্য হয়ে পড়বে। পাতাগুলো ঝরে যাবে। ডালপালা ভেঙে পড়বে। তখন সেই বৃক্ষে আর মুকুল আসবে না, ফল ধরবে না; বরং তা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে। আর বাগানের সৌন্দর্য রক্ষার দাবিই হলো এমন গাছ কেটে ফেলা এবং জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা।

### অন্তর কখন শুকিয়ে যায়

মানুষের অন্তরের ব্যাপারটিও উপরের উদাহরণের মতোই। অন্তর শুকিয়ে যায় যখন নিচের পাঁচটি জিনিস তাতে অনুপস্থিত থাকে :

এক. আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা,

দুই. তাঁর ব্যাপারে জ্ঞান,

তিন. আল্লাহর স্মরণ (যিক্র),

চার. তার নিকট দু‘আ ও প্রার্থনা,

পাঁচ. এবং তাওহীদে বিশ্বাস।

এর কারণ হলো, প্রবৃত্তির তেজ ও লালসা প্রতিনিয়ত হৃদয়কে দগ্ধ করতে থাকে। এতে করে হৃদয়ের শাখা-প্রশাখা ‘ইবাদাতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ফলে হৃদয়ও উপরোক্ত বৃক্ষের মতো একসময় শুধু আগুনেরই উপযুক্ত হয়ে পড়ে।

فَوَيْلٌ لِلْفُسَيْيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ

অতএব, ধ্বংস সে সকল লোকদের জন্য—যাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে আল্লাহর স্মরণ থেকে। তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিপতিত।<sup>৩</sup>

হৃদয় যখন রাহমাতের বর্ষণে সিক্ত থাকে, অজ্ঞা-প্রত্যজ্ঞাগুলো থাকে সতেজ ও কোমল, তখন হৃদয়কে আল্লাহর ‘ইবাদাতের প্রতি আহ্বান করা হলে তা দ্রুত সাড়া দেয় এবং শরীরের প্রতিটি কোষ তখন তার সজ্ঞা দেয়। কল্যাণের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয় এবং প্রত্যেকটি ‘ইবাদাতের যে ভিন্ন ভিন্ন ফল আছে, তা আহরণ করে এবং তা থেকে নিঃসৃত সঞ্জীবনী পানিই তার অন্তর ও অঙ্গাসমূহের মাঝে প্রভাব সৃষ্টি করে। বিপরীতে, অন্তর যদি ‘পানিশূন্য’ (খুশু-খুযু বিহীন) হয়ে পড়ে, তার সঞ্জীবনী শক্তি হারিয়ে ফেলে। ফলে তার শাখা-প্রশাখাও ‘ইবাদাতবিমুখ হয়ে পড়ে।

### অঙ্গাসমূহের ব্যবহারে মানুষের প্রকারভেদ

প্রতিটি অঙ্গা-প্রত্যঙ্গের জন্য রয়েছে সুনির্দিষ্ট কিছু ‘ইবাদাত, বিশেষ কিছু আনুগত্য। এসব ‘ইবাদাতের জন্যই এই অঙ্গা-প্রত্যঙ্গাসমূহের সৃষ্টি এবং এর জন্য রয়েছে উপযুক্ত প্রতিদানও।

অঙ্গাসমূহের ব্যবহারে মানুষ প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত :

#### প্রথম ভাগ :

এই শ্রেণির ব্যক্তি হলেন তারা—যারা তাদের অঙ্গা-প্রত্যঙ্গকে কেবল ওই সকল কাজে ব্যবহার করেন, যে কাজের জন্য তা সৃষ্টি করা হয়েছে। এরা হলেন সেইসব ব্যক্তি, যারা আল্লাহর সাথে ব্যবসা করেন। অধিক মুনাফায় আল্লাহর কাছে নিজেদের বিক্রি করে দেন।<sup>[৪]</sup>

যেহেতু সালাত এমনভাবে আদায়ের কথা বলা হয়েছে যেন অন্তরের সাথে সাথে দেহের প্রতিটি অঙ্গাও এদের উপর নির্ধারিত ‘ইবাদাত আদায় করে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করতে পারে, এই শ্রেণির ব্যক্তিগণ আল্লাহর এইসব নির্দেশনাকে অনুগ্রহ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং সেগুলো যথাযথভাবে মেনে চলেন। ফলে প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে, লোকসম্মুখে কিংবা নির্জনে—সর্বদা তারা নিজেদের অঙ্গা-প্রত্যঙ্গাসমূহ আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত রাখেন। প্রতিপালকের অবাধ্য-অসন্তুষ্টি ডেকে আনে—এমন কাজ থেকে নিজেকে এবং নিজের অঙ্গাসমূহ হিফায়ত করেন।

৪ নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ মু’মিনদের কাছ থেকে তাদের জান আর মাল কিনে নিয়েছেন; কারণ, (বিনিময়ে) তাদের জন্য রয়েছে জন্মাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। অতঃপর (দুশমনদের) হত্যা করে এবং (নিজেরা) নিহত হয়।। সূরা তাওবাহ, ৯ : ১১১



### দ্বিতীয় ভাগ :

যে তার অঙ্গগুলোকে এমন কাজে ব্যবহার করে, যার জন্য সেগুলোর সৃষ্টি হয়নি; তারা সেগুলোকে অবিরাম নিষিদ্ধ ও পাপকাজে ব্যবহার করার মাধ্যমে আল্লাহর অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। এ হলো সেই ব্যক্তি, যাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ, যাদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না। 'আখিরাতের কোনো পাথেয় তারা পায় না; বরং তাদের পরিণাম হলো আল্লাহর অসন্তুষ্টি এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

### তৃতীয় ভাগ :

এ প্রকারের ব্যক্তির অজ্ঞতা ও অলসতার দ্বারা তাদের অঙ্গগুলো অকেজো করে রাখে। তারা না দুনিয়া অর্জন করে, না 'আখিরাত। তারা এমন ব্যক্তি, যারা চরম ক্ষতিগ্রস্ত। দ্বিতীয় প্রকারের চেয়েও বেশি হতভাগা। কেননা, মানুষকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেওয়া হয়েছে কাজের জন্য। অনুসরণ, আনুগত্য ও 'ইবাদাতের জন্য; অনর্থক ফেলে রাখার জন্য নয়। এ ধরনের লোকেরা আল্লাহর কাছে সর্বাধিক ঘৃণিত। দীন ও দুনিয়ার জন্য বোঝা! যে ব্যক্তি বস্তুবাদী দুনিয়ার পেছনে ছুটে শুধু দুনিয়ার ধান্দা করে, 'আখিরাত বরবাদ করে, সে তো অবশ্যই নিন্দিত ও ক্ষতিগ্রস্ত—এতে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু যে দুটিই নষ্ট করে, সে কেমন ক্ষতিগ্রস্ত?

### প্রত্যেকটির উপমা

#### প্রথম উপমা :

প্রথম ভাগ হলো সেই ব্যক্তির মতো, যাকে প্রশস্ত একখণ্ড জমি দেওয়া হয়েছে এবং চাষাবাদের জন্য দেওয়া হয়েছে প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতি। বীজ ও পানি। অতঃপর সে চাষ শুরু করে। মাটিতে হাল দেয়। বীজ বপন করে। নানান সূদের ফলবান বৃক্ষচারা রোপণ করে। এরপর সীমানা-প্রাচীর তুলে জমি বেটনী দেয়। এটুকুতেই সে ক্ষান্ত হয় না; বরং সে প্রহরা বসায়। কীটপতঙ্গ, পশুপাখি এবং অনিষ্টকর প্রাণীর ক্ষতির ব্যাপারে সে সজাগ দৃষ্টি রাখে। প্রতিদিন সে তার ফসলের দেখভাল করে। কোথাও কোনো চারা মরে গেলে সেখানে আরেকটি চারা রোপণ করে। নিয়মিত নিড়ানি দেয়। আগাছা পরিষ্কার করে। এভাবে শ্রম ও সময় দিয়ে সাজিয়ে তোলে



তার প্রশস্ত জমি, এবং জমি থেকে যে ফসল উৎপন্ন হয়, সেগুলো দিয়ে সে তার আরও উন্নতি ঘটায়।

### দ্বিতীয় উপমা :

দ্বিতীয় ভাগ হলো সেই ব্যক্তির মতো, যে তার জমিকে পোকা-মাকড় ও হিংস্র প্রাণীর অভয়ারণ্যে পরিণত করে রেখেছে। ভাগাড় ও নর্দমা বানিয়ে ফেলেছে। চোর-ডাকাত ও অনিষ্টকর মানুষের নিরাপদ আস্তানা করে তুলেছে। চাষাবাদের জন্য তাকে যে যন্ত্রপাতি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো সে এই অমঙ্গল ও অনিষ্টকর প্রাণীর আস্তানা তৈরির সহজিকরণে ব্যবহার করে থাকে।

### তৃতীয় উপমা :

তৃতীয় ভাগ হলো সেই ব্যক্তি, যে তার যন্ত্রগুলো অনর্থক ফেলে রাখে। মরুভূমি ও অনাবাদি জমিতে পানি সিঞ্চন করে। এরপর সে কেবল আশ্রয় ও আফসোস নিয়ে বেঁচে থাকে। এ হলো উদাসীন, অলস ও সীমালঙ্ঘনকারী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত।

এখানে তিন শ্রেণীর ব্যক্তির উপমা উপস্থাপন করা হয়েছে যার মধ্যে প্রথম উপমাটি হলো সচেতন ব্যক্তি। যে জিনিস-পত্রের সঠিক ব্যবহার করেছে। দ্বিতীয় উপমাটি হলো খিয়ানতকারী ব্যক্তির এবং তৃতীয় উপমাটি হলো উদাসীন, অলস ও সীমালঙ্ঘনকারী ব্যক্তির।

### প্রথম ব্যক্তি :

সে যা-ই করে—স্থির থাকে কিংবা নড়াচড়া করে, ওঠে কিংবা বসে, খায় কিংবা পান করে, ঘুমায় কিংবা সজাগ থাকে, কাজ করে কিংবা পড়ে, চুপ থাকে কিংবা কথা বলে, সবকিছুই তার ‘ইবাদাত। সকল অবস্থায় সে আল্লাহর যিকরে, আনুগত্যে নৈকট্যশীল বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। এমন ব্যক্তি চলতে-ফিরতে সর্বদা আল্লাহর হুকুম মানে। তার আনুগত্য করে।

### দ্বিতীয় ব্যক্তি :

দ্বিতীয় ব্যক্তি জীবন অতিবাহিত করে শ্রুটার অবাধ্যতায়। মালিকের বিদ্রোহাত্মকতায়। কেননা, আল্লাহ্ তাকে এই অধিকার দেননি যে, সে তার এসব অজ্ঞা-প্রত্যজ্ঞা তার বিরোধিতায় ব্যবহার করবে। নিষিদ্ধ কাজে প্রয়োগ করবে। অতএব, সে পাপী। নি'য়ামাতের খিয়ানতকারী। তার জন্য রয়েছে অশুভ পরিণতি। সে যা-ই করে সবই তার গুনাহ ও অবাধ্যতা। সর্বাবস্থায় সে অভিশাপ ও ক্ষতিগ্রস্ততায় ডুবে থাকে।

### তৃতীয় ব্যক্তি :

তৃতীয় ব্যক্তি জীবনটা পার করে দিচ্ছে শ্রুটা ও সৃষ্টির ঘণা নিয়ে। সে প্রকৃতির পূজারী। আত্মার অনুসারী। সে তার কোনো কর্ম দ্বারাই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন করতে পারে না। এ ব্যক্তি যে চরম ক্ষতিগ্রস্ত—তা সুস্পষ্ট। কেননা, জীবনের প্রতিটি অমূল্য মুহূর্ত সে অযথা নষ্ট করেছে। তৃতীয় ব্যক্তি হলো উদাসীন, অলস ও সীমালঙ্ঘনকারী।

আল্লাহ্ তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদের প্রতিদিন পাঁচবার সালাতের দিকে আহ্বান করেন। সালাত তার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য রাহমাতস্বরূপ। এর মাধ্যমে তিনি বান্দার ওপর অনুগ্রহ করে থাকেন। উপরন্তু আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সালাতের মধ্যেই আরও নানাবিধ 'ইবাদাতকর্মের ব্যবস্থা করে রেখেছেন—কথার 'ইবাদাত, কর্মের 'ইবাদাত, শোনার 'ইবাদাত, নড়াচড়ার 'ইবাদাত, চুপ থাকার 'ইবাদাত ইত্যাদি—যাতে বান্দা প্রত্যেকটির জন্যই আল্লাহ ঘোষিত নি'য়ামাতসমূহ উপভোগ করতে পারে।

### সালাতের রহস্য

সালাতের রহস্য ও মূল হলো আল্লাহর দিকে মনোযোগী হওয়া। অজ্ঞা-প্রত্যজ্ঞার সাথে অন্তরকেও সালাতে যুক্ত করা। যদি কেউ সালাতে অনামনস্ক হয়ে পড়ে, নিজের সাথে নিজে কথা বলে, নানান বিষয়ে চিন্তা করে, তাহলে তার দৃষ্টান্ত হলো ওই অপরাধীর মতো, যে বাদশাহর দরবারে রওনা হয় নিজের অপরাধ মার্জনার জন্য; বাদশাহর দয়া, দান ও করুণার মেঘ হতে সামান্য বর্ষণের আশায়; কিন্তু যখন সে দরবারে পৌঁছে, সে তখন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাদশাহর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ডানে তাকায়, বামে তাকায়। অর্থাৎ, বাদশাহ যা অপছন্দ করেন তাতে সে লিপ্ত হয়ে যায়।



বাদশাহ যখন তার এই অবস্থা দেখেন; তার ন্যায় ও ইনসাফের দাবি হলো, এমন ব্যক্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা। কোনো দয়া না দেখানো। তবুও তিনি তার প্রতি দয়া দেখান। অনুগ্রহ করেন; কিন্তু চূড়ান্ত পুরস্কার বিতরণের দিন তিনি ঠিকই এই ব্যক্তি এবং খুশু-খুযু সাথে সালাত আদায়কারীর মাঝে বড় একটা পার্থক্য করে দেবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

প্রত্যেকের জন্য তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী বিভিন্ন স্তর রয়েছে, যাতে আল্লাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেন। বস্তুত তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।<sup>[৫]</sup>

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার 'ইবাদাতের জন্য। আর অপর সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকারের জন্য। হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন—

“

হে আদম সন্তান, আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার জন্য। বাকি সব সৃষ্টি করেছি তোমার জন্য। সুতরাং তোমার ওপর আমার কিছু হক রয়েছে। সেসব বস্তু যেন তোমাকে আমার হক থেকে ব্যস্ত করে না রাখে, যা তোমার জন্য সৃষ্টি করেছি।

অন্যত্র আছে—

“

হে মানবপুত্র, তোমাকে আমার 'ইবাদাতের জন্য বানিয়েছি; অবহেলা করো না। তোমার জীবিকার দায়িত্ব আমি নিয়েছি; পেরেশান হয়ো না। হে আদম-সন্তান, তুমি আমাকে চাও, আমাকে পাবে। যদি তুমি আমাকে পেয়ে যাও, তাহলে সব পেয়ে গেলে। আর যদি আমাকে হারাও, তাহলে সব হারালে। সুতরাং তোমার নিকট তো আমিই সর্বাধিক প্রিয় হওয়ার উপযুক্ত।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সালাতকে এমন একটি মাধ্যম বানিয়েছেন যার দ্বারা বান্দা তাঁর নৈকট্য অর্জন, তাঁর সাথে একান্তে কথা বলা, তাঁর ভালোবাসা, দয়া এবং ঘনিষ্ঠতা উপভোগ করার সুযোগ পায়।



## সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে বান্দার উদাসীনতা

এক সালাত থেকে আরেক সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে কখনো কখনো বান্দা ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় নিজেকে গুনাহের কাছে জড়িয়ে ফেলে। উদাসীনতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি তাকে পেয়ে বসে। এভাবে সে তার প্রতিপালকের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। নৈকট্যবঞ্চিত হয়। ফলে 'ইবাদাতের সাথে তার দূরত্ব বাড়তে থাকে। একপর্যায়ে সে নিজেকে শাইতানের কাছে ছেড়ে দেয়। আর শাইতান তাকে আটক করে। বেড়ি পরায়। প্রবৃত্তির কারাগারে বন্দি করে রাখে। এতে করে তার অন্তর সংকীর্ণ হয়ে যায়। অস্থিরতা, দুশ্চিন্তা, আক্ষেপ, মন্দভাব, হীনম্মন্যতা, খারাপলাগা তার ওপর জেকে বসে যদিও এগুলোর পেছনের কারণ সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রে সে উপলব্ধিই করতে পারে না। তার প্রতি আল্লাহর দয়া এই যে, তিনি তার জন্য বহু শাখাবিশিষ্ট এমন 'ইবাদাতের (সালাত) ব্যবস্থা করেছেন, যার প্রতিটি অংশ হতেই সে তার প্রয়োজন অনুপাতে কল্যাণ, অনুগ্রহ এবং নৈকট্য অর্জন করতে পারে।

## ওযু সম্পর্কে কিছু কথা

সালাত আদায়কারী ওযুর মাধ্যমে অপবিত্রতা থেকে নিজেকে পবিত্র করে নেয়। অতঃপর পবিত্র অবস্থায় আল্লাহর সামনে দাঁড়ায়।

প্রভাব অনুসারে ওযুর দুটি দিক রয়েছে। একটা প্রকাশ্য, অন্যটি অপ্রকাশ্য।

প্রকাশ্য দিকটি হলো : শারীরিক পবিত্রতা; অঙ্গসমূহ ধৌত করা।

আর অপ্রকাশ্য দিকটি হলো : অন্তরকে গুনাহ ও অন্যায় কাজসমূহের অপবিত্রতা থেকে তাওবার মাধ্যমে পবিত্র করার সাথে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ তা'আলা উভয় পবিত্রতাকে একসাথে উল্লেখ করেছেন।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারী এবং পবিত্রতা রক্ষাকারীদের পছন্দ করেন।<sup>১)</sup>

রাসূলুমাহ্ সাম্মামাহু 'আলাইহি ওয়া সাম্মাম বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি ওয় শের করে, তখন সে কালিমায়ে শাহাদাত পড়বে। এরপর বলবে—

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

হে আল্লাহ্, আপনি আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আপনি আমাকে পবিত্রদের অন্তর্ভুক্ত করুন।<sup>৭</sup>

তাহলে বান্দার পবিত্রতা পূর্ণতা পাবে :

এক. কালিমায়ে শাহাদাত দ্বারা শিরক থেকে

দুই. তাওবা দ্বারা গুনাহ থেকে

তিন. পানি দ্বারা নাপাকী থেকে

### সালাতের পূর্ণতা যখন মাসজিদে

সালাত আদায়কারী যখন আল্লাহর সামনে যাওয়ার আগে পবিত্রতার সকল ধাপ পূর্ণ করে, তাকে অনুমতি দেওয়া হয় আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করার। তাঁর সামনে দাঁড়ানোর। মাসজিদ আল্লাহর ঘর। মাসজিদ 'ইবাদাতের স্থান। এ কারণে অধিকার ইমামের মতেই, ফরয সালাত মাসজিদে আদায় করা ওয়াজিব।

অন্যদিকে বান্দা যখন দুনিয়াবী কাজে ডুবে যায়, 'ইবাদাত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়, তখন তার অবস্থা দাঁড়ায় পলাতক ভৃত্যের মতো যে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং হৃদয়কে তার প্রভুর জন্য নিয়োজিত করা থেকে বিরত রাখে। অতঃপর যেইমাত্র সে ভৃত্য তার প্রভুর নিকট ফিরে আসে, তার অবাধ্যতা আনুগত্যে রূপ নেয়। তখনই, বান্দা যখন বিনয়ের সাথে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হয় এবং আল্লাহর নিকট নিজেকে সমর্পণ করে, আল্লাহর দয়া এবং করুণা তাকে ঘিরে ফেলে এবং আল্লাহ তাকে তার অনুগত বান্দা হিসেবে গ্রহণ করে নেন।

৭ 'উমার ইবনুল খাতাব রায়িয়ামাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুমাহ্ সাম্মামাহু 'আলাইহি ওয়া সাম্মাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওয় করার পর বলে : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই; আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, নাবী সাম্মামাহু 'আলাইহি ওয়া সাম্মাম তাঁর বান্দা ও তাঁরই রাসূল; হে আল্লাহ্, আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।' তাে তার জন্য আল্লাহের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে। সে নিজ ইচ্ছামতে যেকোনো দরজা দিয়েই তাতে প্রবেশ করতে পারবে। (সহীহ মুসলিম, ২৩৪; তিরমিযী, ৫৫)



## ‘আল্লাহু আকবার’ বলা একটি ‘ইবাদাত

বান্দাকে আদেশ করা হয়েছে, তার চেহারা কিবলামুখি আর অন্তর আল্লাহমুখি করে রাখার জন্য। যেন দুনিয়ার সকল ব্যস্ততা, বুট-ঝামেলা তার অন্তর থেকে বেরিয়ে যায়। এরপর সে মালিকের সামনে দয়াপ্রার্থী দাসের মতো বিনয়ী ভঙ্গিতে দাঁড়াবে। মালিকের সামনে বান্দা তার হাত ছেড়ে রাখবে। মাথা ঝুকিয়ে রাখবে। অন্তরে একাগ্রতা তৈরি করবে। যেন সালাতে তার অন্তর এদিক-ওদিক ছোঁটাছুঁটি না করে।

এভাবে সে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ মনোযোগী হবে। এরপর ভরাট কণ্ঠে তাঁর বড়ত্ব ও মহত্ত্ব প্রকাশে বলবে—‘আল্লাহু আকবার’। অর্থাৎ, আল্লাহ্ মহান। যবানে উচ্চারণের সময় অন্তরকেও উপস্থিত রাখবে। তাহলে তার অন্তরেও একথা প্রোথিত হবে যে, সে যা-কিছু নিয়ে ভাবে, যা-কিছু নিয়ে কল্পনা করে, সেসব তুচ্ছ। আর আল্লাহ্ হলেন সবকিছু থেকে বড়। যদি মুখে উচ্চারণের সাথে সাথে অন্তরও আল্লাহর বড়ত্বের সীকৃতি না দেয়, তাহলে সে বিভিন্ন চিন্তায় মশগুল হয়ে পড়বে। তার অবস্থা এমন দাঁড়াবে যে, সে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে মুখে বলছে ‘তিনি বড়’, অথচ তার অন্তর অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত—যেন সেসব কিছুই তার কাছে আল্লাহর চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ! তবে, তার অন্তর ও জিহ্বা যদি একইসাথে ‘আল্লাহু আকবার’ বলে ওঠে, তার হৃদয় থেকে অহংকারের চাদর সরে যাবে—যা গাইরুল্লাহর (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকিছুর) প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়া থেকে তাকে রক্ষা করবে।

তাকবীর একটি ‘ইবাদাত। যা হৃদয় ও জিহ্বা দ্বারা পূর্ণতা পায় এবং যথার্থভাবে তা আদায় হয়। এই দুটি অঙ্গই আল্লাহ্ ও বান্দার মাঝে দূরত্বের সবচেয়ে বড় কারণ। নৈকট্যলাভের অন্যতম প্রতিবন্ধক।

## ‘সানা পড়া’ একটি ‘ইবাদাত

‘আল্লাহু আকবার’ বলে বান্দা হাত বাঁধবে। তার গুণকীর্তন করবে। সানা পড়বে—



سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ



হে আল্লাহ্, আপনি মহাপবিত্র, আপনার জন্যই প্রশংসা, আপনার নাম  
বারকাতপূর্ণ, আপনার মর্যাদা সর্বোচ্চ।<sup>৮</sup>

যখন সালাত আদায়কারী সানা পড়ল, তখন সে আল্লাহ্র মর্যাদা অনুযায়ী প্রশংসা প্রকাশ  
করল। এর মাধ্যমে সে উদাসীনদের দল থেকে বেরিয়ে গেল। নিঃসন্দেহে উদাসীন্য আল্লাহ্  
ও বান্দার মাঝে বড় অন্তরায়। তাছাড়া, সানা হলো একধরনের সম্ভাষণ, অভিবাদন। এর  
উপমা হলো এমন যে, কেউ যখন বাদশাহর দরবারে প্রবেশ করে প্রথমেই সে সালাম  
পেশ করে, গুণকীর্তন করে। এরপর তার চাওয়া-পাওয়ার আর্জি পেশ করে। সানাও ঠিক  
এমনই। সানায় আছে উপাসকের আদব। উপাস্যের মর্যাদা। এর দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ  
হয়। আল্লাহ্ তাঁর বান্দার ওপর সন্তুষ্ট হন। এবং তার চাওয়া-পাওয়াগুলো পূর্ণ করেন।

### ‘আ‘উযুবিল্লাহ...’ বলা একটি ‘ইবাদাত

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

আমি আল্লাহ্র কাছে বিতাড়িত শাইতান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

অতঃপর যখন তিলাওয়াত শুরু করবে, তার পূর্বে ‘আ‘উযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির  
রজীম’ পাঠ করবে। কেননা, শাইতান এধরনের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বান্দার পদস্বলন  
ঘটাতে বেশি উৎসুক। সে যেকোনো মূল্যে বান্দাকে সালাতে যাওয়া থেকে ফিরিয়ে  
রাখার চেষ্টা করে; কিন্তু যখন সে অক্ষম হয়ে যায়, তখন সে চায়, বান্দার অন্তরকে  
ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে। খুশু-খুযু নষ্ট করতে। তাই সে অন্তরে কুমন্ত্রণা দিতে  
থাকে। যাতে বান্দা আল্লাহ্র সামনে দাঁড়িয়েও গাইবুল্লাহকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।  
তাই বান্দাকে আদেশ করা হয়েছে, সে যেন ‘আ‘উযুবিল্লাহ...’ পড়ে। আল্লাহ্র  
কাছে বিতাড়িত শাইতান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। যেন সে নিজেকে পদস্বলন  
থেকে নিরাপদ রাখতে পারে। অন্তরকে হিফায়ত করতে পারে, এবং সে যেন এমন  
এক নূর অর্জন করতে পারে, যার দ্বারা সে কুর’আনের মর্ম অনুধাবন এবং এর  
গভীরতায় পৌঁছতে পারবে; যা অন্তরের জন্য এক সঞ্জীবনী সুধা। বান্দার সাফল্য।  
অতএব, শাইতান চায় কুর’আন পাঠের উদ্দেশ্য থেকে তাকে দূরে রাখতে।

আল্লাহ্ শাইতানের ব্যাপারে অবগত রয়েছেন। অবগত রয়েছেন তার হিংসা এবং শত্রুতা সম্পর্কে। তিনি এও জানেন—তার বান্দা শাইতানের মুকাবিলা করতে অক্ষম, অপারগ। তাই তিনি তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়া এবং আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন; যেন শাইতানের মুকাবিলায় তিনিই বান্দার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। যেন বান্দাকে বলা হচ্ছে, ‘তোমার শক্তি নেই এই শত্রুর সাথে লড়াই করার; অতএব, তুমি আমার সহায়তা গ্রহণ করো। আমাকে ডাকো। আমি তোমাকে তার কুমন্ত্রণার নাগপাশ থেকে বাঁচিয়ে রাখবো।’

### ইবনু তাইমিয়ার উপদেশ

একবার শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (আল্লাহ্ তার আত্মাকে পবিত্র করুন, তার কবরকে আলোকিত রাখুন) শাইতানের কবল থেকে আশ্রয় প্রার্থনার ব্যাপারে আমাকে রূপক একটা উদাহরণ দিয়ে বললেন—

যদি কখনো পালের কোনো কুকুর তোমাকে দেখে আক্রমণের চেষ্টায় ঘেউ ঘেউ শুরু করে, তুমি তার সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ো না; বরং রাখালকে ডাকবে এবং তার সাহায্য চাইবে। সে-ই তোমাকে কুকুরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে।

যখন কোনো বান্দা অভিশপ্ত শাইতান হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে (অর্থাৎ, আ‘উযুবিল্লাহ... পাঠ করে), তখন শাইতানের প্ররোচনা এবং মন্দ প্রভাব থেকে তিনি তাকে নিরাপদ রাখেন এবং তার অন্তরকে শৃঙ্খলমুক্ত করেন।

ফলে সালাত আদায়কারীর অন্তর কুর’আনের অর্থ উপলব্ধির প্রতি মনোযোগী হয়। কলামুল্লাহ্‌র মনোরম বাগানে বিচরণ করতে থাকে। এতে সে ওইসকল আশ্চর্যজনক দৃশ্যগুলো পরিদর্শন করে, যা তার বিবেক-বুদ্ধিকে আরও শাগিত করে এবং এর রহস্যভাণ্ডার থেকে সে এমন সব জিনিস বের করে আনে, যা কোনো চোখ ইতোপূর্বে দেখেনি। যার বর্ণনা কোনো কান কখনো শোনেনি। এমনকি কোনো অন্তর তা কখনো কল্পনাও করেনি!

নাফস এবং শাইতানের প্ররোচনাই এসব বিস্ময় থেকে তাকে দূরে রাখে। কারণ, নাফসের বৈশিষ্ট্যই হলো শাইতানের কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনায় প্রভাবিত হয়ে পড়া। তবে সে যখনই শাইতান থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়, আল্লাহ্ তার অন্তরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন। সত্যের পথে তাকে অটল রাখেন এবং পরম শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদান করেন।



সালাত আদায়কারী যখন তিলাওয়াত আরম্ভ করে, তখন সে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহর সাথে কথা বলতে থাকে। একান্তে। নিভৃতে। তখন সে যেন খুব সতর্ক থাকে আদবের ব্যাপারে। আল্লাহর সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে। গাইবুল্লাহর দিকে অন্তর ধাবিত হওয়ার ব্যাপারে। কেননা, মালিকের সামনে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্ক থাকা বেয়াদবী, যা তাঁর ক্রোধকে ত্বরান্বিত করে।

এমন লোক তো ওই ব্যক্তির মতো, যাকে দুনিয়ার কোনো প্রতাপশালী বাদশাহ অনুগ্রহ দেখালেন, কাছে ডাকলেন। এরপর তার সাথে একান্তে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। আর সে কিনা একবার ডানে তাকায়, একবার বামে তাকায়। বাদশাহ কী বলছেন, সেদিকে তার কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। এতে বাদশাহ কেমন রাগান্বিত হবেন? নিশ্চয়ই অনেক। তাহলে এমনটি যদি আসমান ও যমীনের নিয়ন্ত্রক, বিশ্বজগতের প্রতিপালক, পরাক্রমশালী বাদশাহ আল্লাহর সম্মুখে হয়, তাঁর ক্রোধের মাত্রা কেমন হতে পারে?

### ফাতিহা; আল্লাহ ও বান্দার কথপোকথন

সালাত আদায়কারী ব্যক্তির উচিত সূরা ফাতিহার প্রত্যেক আয়াত এমনভাবে থেমে থেমে পড়া—যেন সে তিলাওয়াতের সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জবাবের জন্য অপেক্ষা করছে। অর্থাৎ, যখন সে পড়বে—

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার—যিনি সকল সৃষ্টিজগতের পালনকর্তা।

তখন সে কল্পনা করবে, আল্লাহ তার প্রশংসা শুনছেন এবং বলছেন—

حَمْدِي عَبْدِي

আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।

যখন সে পড়বে—

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু।

তখন কিছু সময়ের জন্য থামবে এবং আল্লাহর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করবে। কল্পনা করবে, তিনি বলছেন—

أَتْنِي عَلَى عَبْدِي

আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করছে।

যখন সে পড়বে—

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

যিনি বিচার দিনের মালিক।

তখন সে একটু অপেক্ষা করবে। কল্পনা করবে, তিনি বলছেন—

مَجَّدَنِي عَبْدِي

আমার বান্দা আমার ‘আজমাতের (বড়ত্বের) প্রশংসা করেছে।

এরপর যখন সে পড়বে—

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

আমরা একমাত্র আপনারই ‘ইবাদাত করি এবং শুধু আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি।



আল্লাহর জবাবের জন্য তখন সে একটু থামবে। কল্পনা করবে, উত্তরে তিনি বলছেন—

هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي

আমার ও আমার বান্দার মাঝে এটাই পার্থক্য।

এরপর যখন বান্দা পড়ে—

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

আমাদের সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি আপনার গাযব পতিত হয়েছে, তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

কল্পনা করবে, তখন আল্লাহ্ বলছেন—

هَذَا لِعَبْدِي مَا سَأَلَ

আমার বান্দা যা চেয়েছে তা পাবে।<sup>[২]</sup>

এভাবে বান্দা প্রতি আয়াতে আল্লাহর উত্তরের প্রতি মনোনিবেশ করবে।

যে ব্যক্তি সালাতের সুাদ পেয়েছে, সে জানে, তাকবীর ও ফাতিহার বিকল্প হয় কিছুই হতে পারে না। যেভাবে কiyাম, রুকু' ও সিজদার কোনো বিকল্প হতে পারে না। সালাতের প্রতিটি কর্মই ভিন্ন ভিন্ন 'ইবাদাত। প্রতিটি 'ইবাদাতের সুাদ ও রহস্য প্রভাব ও গুরুত্ব একদম ভিন্ন। যার কোনোটাই অন্যটার সমকক্ষ কিংবা বিকল্প হতে পারে না। এমনকি সূরা ফাতিহার প্রতিটি আয়াতও এক একটি 'ইবাদাত। একেকটি সুাদ একেক রকম।

৯ মুসলিম, ৩৯৫; নাসায়ী, ৯০৯; আবু দাউদ, ৮২১; তিরমিযী, ২৯৫৩

এখানে আল্লাহর বাণী :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

তার নাম এবং সীফাতসমূহের সম্পূর্ণতা নির্দেশ করে এবং যাবতীয় দোষ-ত্রুটি ও অক্ষমতা থেকে তার পবিত্রতা ঘোষণা করে। নিশ্চয় তিনি তার কর্মে, বৈশিষ্ট্যে এবং নামসমূহে প্রশংসিত। সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি ও অক্ষমতা থেকে মুক্ত। তার প্রতিটি কাজ প্রজ্ঞাপূর্ণ। রাহমাতবাহী ও কল্যাণকর। তার সকল সিদ্ধান্ত ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ। তিনি সকল গুণে পরিপূর্ণ। তিনি তার নামসমূহে অতুলনীয়।

### ‘হামদ’-এর মর্ম

দুনিয়া-’আখিরাত, আসমান-যমীন এবং এর মধ্যবর্তী যা কিছু আছে, সব আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলার প্রশংসায় পরিপূর্ণ। জগতের সকল বস্তু তাঁর প্রশংসায় লিপ্ত। সকল সৃষ্টি তাঁর প্রশংসায় আত্মপ্রকাশ করে, এবং সবকিছু তাঁর প্রশংসার ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেকটি জিনিস-ই অস্তিত্বে আসে এবং অনস্তিত্ব হয় তাঁর প্রশংসার দ্বারা। সুতরাং তাঁর প্রশংসাই সকল সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সকল বস্তু তাঁর প্রশংসার সাক্ষী। তাঁর প্রশংসার জন্যই নাবীদের প্রেরণ করা হয়েছে। কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে। তার প্রশংসাকারীদের জন্যই জাহান্নামকে সজ্জিত করা হয়েছে। আর প্রশংসা বর্জনকারীদের জন্যই জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে। জাহান্নাম ও জাহান্নামের অস্তিত্ব তার প্রশংসার ভিত্তিতেই।

আল্লাহর হামদ (প্রশংসা) করা ‘ইবাদাত। হামদ না করাই মা’সিয়াত (গুনাহ)। তার হামদ ছাড়া গাছের একটি পাতাও ঝরে না। গ্রহে কিংবা ভিনগ্রহে কোনো কিছুই তার হামদ ব্যতীত সামান্য নড়াচড়ার অধিকার রাখে না। তিনি এমন এক সত্তা—যা সত্তাগতভাবেই প্রশংসিত, যদি বান্দা তাঁর প্রশংসা নাও করে। যেমন বান্দা তাঁর তাওহীদের সাক্ষ্য না দিলেও তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তিনিই একমাত্র উপাস্য যদিও বান্দা তাঁর উপাসনা না করে। তিনি তো এমন পবিত্র সত্তা, যিনি প্রশংসাকারীদের যবান দিয়ে নিজের প্রশংসা আদায় করে নেন। যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর নাবীর যবানে বলিয়েছেন—





سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে, তিনি তার কথা শোনেন।<sup>১০</sup>

পরোক্ষভাবে এমনটিও বলা যায় যে, বান্দার যবানে মূলত তিনি নিজেই নিজের প্রশংসাকারী। কারণ, তিনিই বান্দার অন্তরে ও মুখে তাঁর স্তুতি জারি করে দিয়েছেন। সুতরাং সকল প্রশংসা তাঁর জন্য। সকল রাজত্বও তাঁরই জন্য। যাবতীয় কল্যাণ তার হাতে। সবকিছুর প্রত্যাবর্তনও তাঁর দিকে, প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে।

এতক্ষণ যা বলা হলো তা হামদের সামান্য এক ব্যাখ্যা। মহা সমুদ্রের তুলনায় এ কেবল একটি ফোঁটা মাত্র!

যদি কোনো নি'য়ামাত প্রাপ্তির পর বান্দা তাঁর প্রশংসা করে, তখন এ প্রশংসা করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হওয়া আরেক প্রশংসার দাবি রাখে। তার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আরেক প্রশংসা এবং তার জন্য আবার প্রশংসা...এভাবে চলতেই থাকবে।

সত্যিকার অর্থে বান্দা যদি তার প্রতিটা শ্বাসপ্রশ্বাস কেবল আল্লাহর একটিমাত্র নি'য়ামাতের প্রশংসার জন্যও নিয়োজিত রাখে, জীবন ফুরিয়ে যাবে, তবুও আল্লাহ প্রতি তার প্রশংসা যথেষ্ট হবে না। আর তাঁর নি'য়ামাত তো অগণিত। অসংখ্য।

তিনিই তাঁর বান্দাকে হামদ-এর জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন। সে জন্যও তিনি প্রশংসার দাবি রাখেন।

যদি তিনি কোনো নি'য়ামাত নাও দিতেন, তবু তিনি তাঁর বান্দাকে যে বিপদ-আপদ দেওয়া থেকে হিফায়ত করেছেন, সেজন্য তিনি প্রশংসার উপযুক্ত। ইমাম আওযাই রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

আমি কাউকে বলতে শুনছি, সকল প্রশংসা তোমারই জন্য। নি'য়ামাতের জন্য হোক কিংবা বিপদ না দেওয়ার কারণেই হোক।<sup>১১</sup>

১০ ...আর যখন ইমাম 'সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে, তখন তোমরা 'আল্লাহুমা রব্বানা লাকল হামদ' বলবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মুখ দ্বারা বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তা'আলা তা শোনেন। (সহীহ মুসলিম, ৪০৪; নাসায়ী, ১২৮০)

১১ তারীখে বাগদাদ, ৬/১২২

আবার, আল্লাহ তার বান্দাকে সঠিক পথ প্রদর্শন না করলে, সে কোনোভাবেই তার হামদ আদায়ে সক্ষম হতো না। আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে বান্দার অন্তরে হামদ প্রক্ষেপণ করেছেন। সুতরাং তিনি এর জন্যও প্রশংসিত। বেননা, তিনিই তা বান্দার জিহ্বা ও অন্তরে জারি করেছেন। যদি আল্লাহ পথ না দেখাতেন, তাহলে কে আছে যে নিজ প্রচেষ্টায় পথপ্রাপ্ত হতো?

বান্দার জন্য আবশ্যিক হলো সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা এবং তার প্রশংসা করা। সুখে থাকুক কিংবা দুঃখে, সকল মাখলুক তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। চাই সে নেককার হোক বা পাপী, সম্মানিত হোক বা অপমানিত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সর্বাবস্থায় তার প্রশংসার উপযুক্ত। যদিও তার কর্মের নেপথ্য কারণ আমাদের অন্তর্দৃষ্টির বাইরে। সুতরাং যে বান্দা আল্লাহর যত নিকটবর্তী হবে, তার কৃতজ্ঞতাপ্রকাশও ততই আন্তরিক হয়ে উঠবে।

‘আলহামদু লিল্লাহ্’ এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দার অন্তরে ঐশী অনুপ্রেরণা। নাবী করিম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুপারিশের হাদীসে বলেছেন—



হাশরের দিন আমি সিজদায় পড়ে যাব। অতঃপর আল্লাহ আমার অন্তরে ইলহাম<sup>[১২]</sup> প্রক্ষেপণ করবেন। ফলে আমি এমন সব বাক্য দ্বারা তার প্রশংসা করব, যা কখনো আমার অন্তরে উদয় হয়নি।

## ‘রব্বিল ‘আলামীন’ বলা একটি ‘ইবাদাত

رَبِّ الْعَالَمِينَ

জগৎসমূহের একমাত্র প্রতিপালক

এখানে ‘রব’ একবচন। অর্থ, একজন প্রতিপালক। ‘আলামীন’ হলো বহুবচন, অর্থ, জগৎসমূহ। ‘রব্বিল ‘আলামীন’ অর্থ : জগৎসমূহের একমাত্র প্রতিপালক। এতে একত্ববাদের সাক্ষ্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বিশ্ব-জাহানের একমাত্র রব। তিনি

১২ ইলহাম হলো এক দরনের অনুপ্রেরণা, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোনো প্রকার বাহ্যিক উৎসের যোগসূত্রতা ছাড়াই অন্তরে অনুভব করেন।



সবকিছুর স্রষ্টা, রিয়্যকদাতা, নিয়ন্ত্রণকর্তা। তিনি জীবন দেন। তিনিই মৃত্যু দেন। তিনি এক ও একমাত্র ইলাহ। ‘ইবাদাতের উপযুক্ত সত্তা। দুর্যোগে সাহায্যকারী। বিপদে আশ্রয়দানকারী। তিনি ছাড়া কোনো রব নেই। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।

## ‘আর-রহমানির রহীম’ বলা একটি ‘ইবাদাত

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু।

এই বাক্যটি বলা বিশেষ একটি ‘ইবাদাত। আল্লাহর অসীম দয়া ও করুণার বর্ণন। এটি। তাঁর দয়া সকল মাখলূকের ওপর ব্যাপ্ত। গোটা দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু তাঁর অনুগ্রহ ও রাহমাতের ওপর টিকে আছে।

প্রকৃতপক্ষে, এটিও আল্লাহর একটি বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ যে, বান্দা আল্লাহ সামনে দাঁড়ানোর সুযোগ পাচ্ছে। হাদীসে এসেছে,

‘আল্লাহ্ তা‘আলা প্রতি রাতে জিবরা’ঈল ‘আলাইহিস সালাম-কে বলেন,  
‘অমুককে সালাতের জন্য জাগিয়ে দাও, অমুককে ঘুম পাড়িয়েই রাখো।

সুতরাং এটা তার বিশেষ রাহমাত যে, তিনি বান্দাকে গভীর রজনীতে সালাতে দাঁড় করিয়ে দেন। তার সাথে নির্জনে কথা বলেন। বান্দা তখন অনুনয়-বিনয় করে। দয়া প্রার্থনা করে। তাকে ডাকে। তার কাছে হিদায়াত ও রাহমাত কামনা করে। দুনিয়া ও ‘আখিরাতে এমন বান্দাদের ওপর তার নি‘য়ামাত পরিপূর্ণ। এই বিশেষ রাহমাত থেকে যারা দূরে রয়েছে, তারা সত্যিই বঞ্চিত।

এছাড়াও আল্লাহর রাহমাত সকল মাখলূকের ওপর বিস্তৃত। যেমন তার হামদ ও ‘ইলম সর্বত্র বিস্তৃত।

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا

হে আমাদের পালনকর্তা, আপনার রাহমাত ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত।<sup>[১৩]</sup>

‘মা-লিকি ইয়াউ মিদীন’ বলা একটি ‘ইবাদাত

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

বিচার দিবসের মালিক।

অতঃপর বান্দা ‘মা-লিকি ইয়াও মিদীন’ বলবে। তার হীনতা ও বশ্যতা প্রকাশ করবে। নিজেকে সমর্পণ করবে। আল্লাহ্ ইনসাফ ও পরিমাপযন্ত্র স্থাপনের কথা, এবং বিচার দিবসের কথা স্মরণ করে নিজেকে পাপ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। এ আয়াত পড়ার সময় একথাও চিন্তা করবে যে, নিশ্চয় কিয়ামাত প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ্ হবেন বিচারক। তিনি মানুষের মাঝে ফয়সালা করবেন। ভালো-মন্দের প্রতিদান দেবেন। তার বিচারকার্যও প্রশংসার অস্তিত্ব। কুর’আনে ইরশাদ হয়েছে,

وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

তাদের সবার মাঝে ন্যায় বিচার করা হবে। বলা হবে, সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র।<sup>[১৪]</sup>

বর্ণিত আছে, বিচারকার্য সমাধানের পর সেদিন জান্নাত ও জাহান্নামের সকল অধিবাসী তার ন্যায়, ইনসাফ ও অনুগ্রহের প্রশংসা করবে।

সানা ও তামজীদের পার্থক্য

সালাত আদায়কারী যখন ‘আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল ‘আলামীন’ বলে, তার জবাবে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন—

১৩ সূরা গাফির, ৪০ : ০৭  
১৪ সূরা যুমার, ৩৯ : ৭৫



مَحْمَدِي عَبْدِي

বান্দা আমার হামদ—তথা প্রশংসা করল।

যখন বান্দা ‘আর রহমানির রহীম’ বলে, তো এর মাধ্যমে সে আল্লাহর প্রশংসার পুনরাবৃত্তি করল। তাঁর একাধিক গুণ বর্ণনা করল। তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন—

أَنْتَ عَلَى عَبْدِي

বান্দা আমার সানা—তথা প্রশংসা করল।

এখানে আল্লাহ ‘সানা’ শব্দের ব্যবহার করেছেন। ‘সানা’ বলা হয় বারংবার প্রশংসা করা; প্রশংসিত ব্যক্তির একাধিক গুণ বর্ণনা করাকে। এখানে ‘আলহামদু লিল্লাহ’ শুধু প্রশংসা। ‘রহমানির রহীম’ আল্লাহর গুণাবলিসহ একাধিক বার প্রশংসা।

এরপর সালাত আদায়কারী বলবে—

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

বিচার দিবসের মালিক।

এ বাক্যে রয়েছে বিচার দিবসে তার একক ক্ষমতা, দ্বীন ও দুনিয়ার বাদশাহী, তার বড়ত্ব ও মহত্ত্ব, একত্ববাদ, নাবী-রাসূল প্রেরণের সত্যতার কথা। এর উত্তরে আল্লাহ তা‘আলা বলেন—

مَحْمَدِي عَبْدِي

বান্দা ‘তামজীদ’-এর সাথে আমার প্রশংসা বর্ণনা করল।

এখানে আল্লাহ ‘তামজীদ’ শব্দের ব্যবহার করেছেন। তামজীদ বলা হয় ন্যায়-ইনসায়ফ, দয়া-অনুগ্রহ এবং মহিমা ও মহত্ত্ব প্রকাশ্যে যে প্রশংসা করা হয় তাঁকে।

‘ইয়্যাকা না‘বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতা‘দিন’ বলা একটি ‘ইবাদাত

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

আমরা একমাত্র আপনারই ‘ইবাদাত করি এবং শুধু আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

‘ইয়্যাকা না‘বুদু’ পড়ার পর সে একটু থামবে।

প্রতিপালক জবাবে বলেন—

هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ

আমার আর আমার বান্দার মাঝে এটাই পার্থক্য। আমার বান্দা যা চেয়েছে, তা পাবে।

বান্দা এই দুটি ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) বাক্যের গভীরে মনোনিবেশ করবে। বাক্য দুটির মর্ম নিয়ে চিন্তা করবে। এখানে দুটি অংশ। একটি আল্লাহর জন্য (إِيَّاكَ نَعْبُدُ)। একটি বান্দার জন্য (وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)। উভয় বাক্য তাওহীদের সাফল্য বহন করে।

‘ইয়্যাকা না‘বুদু’ বললে একজনই উপাস্য ; ‘وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ’ বললে একজনই সাহায্যকারী বোঝায়।

চিন্তা করবে, এই বাক্য দুটি সূরা ফাতিহার ঠিক কোন স্থানে আছে? মাঝখানে। তার শুরুরে আছে স্তুতি ও প্রশংসাবাক্য। পরে আছে দু‘আ ও প্রার্থনাবাক্য।

বান্দা অনুপ্রাণন করার চেষ্টা করবে, ‘ইবাদাতকে ‘সাহায্যপ্রার্থনার’ আগে কেন আনা হয়েছে?’

কেন অবজ্ঞেষ্ঠকে (বিদেষ্য) সাবজেক্ট (উদ্দেশ্য)-এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে? মনোযোগী হয়ে চিন্তা করবে, কেন তিনি সর্বনাম বার বার উল্লেখ করেছেন? (‘আরবীতে সর্বনাম বার বার উল্লেখ করা হয় ব্যক্তি বা সত্তার সম্মান ও গুরুত্ব বোঝানোর জন্য)

‘ইবাদাত’কে আগে আনার কারণ :

সূরা ফাতিহায় ‘ইবাদাত’কে ‘সাহায্যপ্রার্থনার’ আগে আনা হয়েছে। কেননা, ‘ইবাদাত ‘আল্লাহর জন্য। সাহায্য বান্দার জন্য। আল্লাহ্ তা‘আলা উপাস্য। তিনি উপাসনার পর বান্দাকে সাহায্য করেন। সুতরাং আগে ‘ইবাদাত, পরে উজরত (প্রতিদান)।



‘ইবাদাত’ দ্বারা উদ্দেশ্য—

إِيَّاكَ أُرِيدُ بِعِبَادَتِي

আমার ‘ইবাদাত দ্বারা কেবল তোমাকেই চাই।

অতএব, যাবতীয় নেককাজ—যা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য করা হয়—তা ‘ইবাদাতের’ অন্তর্ভুক্ত, এবং আল্লাহর মারেফাত, মুহাব্বাত, সাদাকাত ও ইখলাসের দিকে পথ প্রদর্শক সকল উপকারী ‘ইলম’ ‘ইবাদাতের’ শামিল।

সাহায্য দ্বারা বান্দার সকল কাজে তাওফীকপ্রাপ্ত হওয়া উদ্দেশ্য। সুতরাং যে ‘ইবাদাত আল্লাহর জন্য হয় না, তা প্রত্যাখ্যাত, এবং যে সাহায্য আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা‘আলা ছাড়া অন্য কারও কাছে চাওয়া হয় তা বিবর্জিত। এতে কেবল রয়েছে অপমান, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা।

উভয় বাক্যের মর্ম :

প্রত্যেকের গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত এই আয়াত থেকে নিসৃত উপকারী জ্ঞান নিয়ে—যা ‘ইবাদাতের’ বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে মানুষকে সাহায্য করে এবং রক্ষা করে আমলের ঘাটতি ও বাঁচিয়ে রাখে যাবতীয় হারাম কাজ থেকে।

আর ভাবনার বিষয়, দুটি মাত্র বাক্যে তাঁর সকল সৃষ্টির রহস্য, আদেশ ও নিষেধ, সাওয়াব ও শাস্তি, দুনিয়া ও ‘আখিরাতের’ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কতটা সুগভীরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে! আদতে পুরো কুর’আনের সারমর্মই এই দুটি বাক্য।

এখানে বুঝতে হবে, কীভাবে সর্বনামে নাম পুরুষ থেকে উত্তম পুরুষের দিকে উঠে আসা হয়েছে? এ বিষয়টি বিস্তারিত বোঝাতে গেলে বড় একটি গ্রন্থ রচনা করা যাবে। এটি যদি আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত না হতো, তাহলে আরও আলোচনা করতাম। এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বিবরণ দিতাম। কারণ যদি এ বিষয়ে অধিক জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা থাকে, তাহলে সে মারাহিলুস সা-ইরিন এবং আররিসালাতুল মুসরিয়া নামক গ্রন্থ দুটি দেখতে পারে।

## ‘ইহদিনাস সিরাতল মুসতাকীম’ বলা একটি ‘ইবাদাত

এবার সে চিন্তা করুক, সাহায্য হিসেবে তার কোন জিনিস সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন?  
একজন বিশ্বাসীর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো হিদায়াত। তাই সে বলবে—

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

আমাদের সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।

‘হিদায়াত’ একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এতে বেশ কয়েকটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত।

এক. হক (সত্য) চেনা।

দুই. হকের রাস্তা পাওয়া।

তিন. হকের ওপর ‘আমাল করা।

চার. হকের দিকে মানুষকে আহ্বান করা। এর ওপর চলতে গিয়ে যত বাধা-বিপত্তি আসে, তার ওপর ধৈর্যধারণ করা।

পাঁচ. মৃত্যু পর্যন্ত হকের ওপর অটল থাকা।

যার মধ্যে এই পাঁচটি বিষয়ের উপস্থিতি পরিপূর্ণভাবে আছে, সে পূর্ণ হিদায়াতপ্রাপ্ত।  
যার কোনোটা কম আছে, তার হিদায়াতও ত্রুটিপূর্ণ। সুতরাং মৃত্যু পর্যন্ত বান্দা সদা  
সর্বদা এই পূর্ণ হিদায়াতের মুখাপেক্ষী।

এছাড়াও হিদায়াতের আরও কিছু অর্থ রয়েছে। যেমন :

১. যে ভ্রান্ত আকীদা, ভুল বিদ্যা ও অসৎ সংকল্পের ওপর রয়েছে, সে তাওবার মুখাপেক্ষী। এই তাওবা-ই এখানে তার হিদায়াত।
২. যে ইসলামের মৌলিক ধারণাটুকু রাখে, তার জন্য বিস্তারিত জানাই হলো হিদায়াত।
৩. যে ইসলামের কিছু বিধান মানে কিছু মানে না, তার জন্য পূর্ণ ইসলাম মানার তাওফীকপ্রাপ্ত হওয়া হলো হিদায়াত।



৪. যে ইসলামের সকল বিধিবিধান মানে, তার জন্য ভবিষ্যতেও এর ওপর সির ও অটল থাকা হলো হিদায়াত।

৫. যার কোনো আকীদা-বিশ্বাস নেই, তার জন্য বিশুদ্ধ আকীদাই হিদায়াত।

৬. যে ভ্রান্ত আকীদায় বিশ্বাসী, ভ্রান্ত আকীদা থেকে বেরিয়ে আসা এবং বিশুদ্ধ আকীদা লালন করাই হলো তার জন্য হিদায়াত।

৭. যে ব্যক্তি নেককাজ করতে সক্ষম, কিন্তু নেককাজের কোনো ইচ্ছা বা আগ্রহ নেই, তার জন্য নেককাজে আগ্রহ তৈরি হওয়াই হিদায়াত।

৮. যে ব্যক্তির ইচ্ছে আছে, কিন্তু শক্তি নেই, সামর্থ্য নেই; সুতরাং শক্তি-সামর্থ্য লাভ করাই তার জন্য হিদায়াত।

৯. যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের ইচ্ছে রাখে না, শক্তিও রাখে না, সে উভয়ের মুখাপেক্ষী। এই ইচ্ছা এবং শক্তি লাভ করাই তার হিদায়াত।

১০. যে আকীদা ও বিশ্বাস, 'ইলম ও 'আমালে হিদায়াতপ্রাপ্ত; তার জন্য হিদায়াত হলো এর ওপর অটল ও অবিচল থাকা।

হিদায়াত হলো বান্দার সবচেয়ে বড় চাওয়া এবং অতীব প্রয়োজনীয় জিনিস। সবই হিদায়াতের মুখাপেক্ষী। এ কারণে দয়াময় প্রভু প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সাতাতে সূর ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে হিদায়াত প্রার্থনা ফরয (আবশ্যিক) করে দিয়েছেন। এতেই প্রতীয়মান হয় যে, একজন বান্দার জন্য হিদায়াত অর্জন করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মৌলিক হিদায়াতের ভিত্তিতে মানুষকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

এক. মুন'ইম। অর্থাৎ, পুরস্কারপ্রাপ্ত। যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা হিদায়াত দান ও তা সংরক্ষণের মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন। তারা তাদের নিজেদের অর্জিত হিদায়াতের স্তর মোতাবেক পুরস্কার পাবে।

দুই. দমুন। অর্থাৎ, পথভ্রষ্ট। তাদেরকে হিদায়াত দেওয়া হয়নি। কারণ, তারা নিজেদেরকে এর জন্য প্রস্তুতও করেনি।

তিন. মাগদুব। অর্থাৎ, অভিশপ্ত। যারা সত্য চিনেছে; কিন্তু সত্যকে গ্রহণ করেনি।

প্রথম দল হিদায়াতপ্রাপ্ত। সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিশুদ্ধ আকীদা ও বিশ্বাস লালনকারী এবং এরাই পুরস্কারের উপযোগী। দ্বিতীয় দল পথভ্রষ্ট। তারা অজ্ঞতাবশত সত্য থেকে দূরে সরে যায় ফলে তার হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়। তৃতীয় দল অভিশপ্ত। কারণ, সত্যকে চেনা এবং জানার পরেও তারা তা অনুসরণ করে না। সত্যকে গ্রহণ করে না।

## আমীন ও রাফ'উল ইয়াদাইন

বান্দা সূরা ফাতিহা শেষে 'আমীন' বলবে দু'আ কবুল হওয়ার আশা ও আস্থা নিয়ে, এবং আমীন জোরে পড়তে হবে। কেননা, সালাতে মু'মিনের জোরে আমীন বলা শুনে ইয়াহুদীদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যেত। তারা হিংসায় ফেটে পড়ত।<sup>[১৫]</sup>

রুকু'তে যাওয়ার সময়ে দুই হাত উঠাবে। অর্থাৎ, রাফ'উল ইয়াদাইন করবে। এতে আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন হয়। এটি হাতের বিশেষ 'ইবাদাত। যেমন অন্যসব অঙ্গেরও বিশেষ বিশেষ 'ইবাদাত রয়েছে। এছাড়া এটি রাসূলের সুন্নাত, সালাতের সৌন্দর্য। নিদর্শন ও মর্যাদা।<sup>[১৬]</sup>

প্রত্যেক ওঠা-বসায়, এক রুকন থেকে আরেক রুকনে যাওয়ার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলবে। আল্লাহর বড়ত্বের ঘোষণা দিবে। কেননা, সালাতে তাকবীর হলো হজে তালবিয়া পাঠের মতোই। হাজীরা যেমন এক ঘাঁটি থেকে অন্য ঘাঁটি, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার সময় তালবিয়া (লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা শারীকা লাকা লাব্বাইক...) পড়ে। এটা হজের নিদর্শন। তদ্রূপ সালাতের প্রত্যেক অবস্থান পরিবর্তনে তাকবীর বলবে। এটা সালাতের তালবিয়া এবং নিদর্শন।

## রুকু' একটি 'ইবাদাত

অতঃপর রুকু' করার দ্বারা আল্লাহর প্রতি সম্মান ও বিনয় প্রদর্শন করবে। তার প্রতিপত্তির কাছে নিজের অসহায়ত্ব, তার 'ইয়াদাতের কাছে নিজের তুচ্ছতা, নগন্যতা প্রকাশ করবে। রুকু'তে মহান প্রভুর প্রশংসা করা একজন দাসের জন্য আবশ্যিক।

১৫ আদাবুল মুফরাদ, ৯৯৭; ইবনু মাজাহ, ৮৫৬

১৬ সালাতে উচ্চসুরে আমীন বলা, রাফ'উল ইয়াদাইন করা, এসব সুন্নাত কিংবা মুস্তাহাব পর্যায়ের আমল। ইমামদের মাঝে এ নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজ নিজ মতের পক্ষে দলীল-প্রমাণ। অতএব, এসব বিষয় নিয়ে উম্মাহর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা কোনোভাবেই কাম্য নয়।



কারণ, দাসের বৈশিষ্ট্যই হলো নিজেকে প্রভুর নিকট সমর্পণ করা।

আর বান্দা রুকুতে নিজের মেরুদণ্ড বিছিয়ে দিবে। হাঁটুর ওপর ভর দিবে। মাথা ঝোঁকানো থাকবে। পিঠ ও ঘাড় সমান রাখবে। আর তাকবীর বলতে বলতে রুকু'তে যাবে। এরপর তাসবীহ পড়বে—

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

আমি আমার প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।<sup>১৭</sup>

রুকু'তে তিনটি বস্তুর খুশু-খুযু রয়েছে।

এক. অন্তরে খুশু। সেটা হলো মনোযোগী ও বিনয়ী হওয়া।

দুই. অঙ্গসমূহের খুশু। দেহকে নত করা।

তিন. মুখের খুশু। তাসবীহ পাঠ করা। যিক্র করা। এভাবে রুকু' করাই হলো রুকু'র পূর্ণতা। মানুষের প্রতি বিনীত আর স্রষ্টার কাছে বিনয়াবনত হওয়ার পার্থক্যটা এখানে বুঝে আসে। কেননা, মানুষ যত বড়ই হোক সে কারও-না-কারও গোলাম। গোলামের কাজ হলো দাসত্ব; আর আল্লাহ্ হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তার সিফাত হলো, 'আজমাত (বড়ত্ব)।

মোটকথা, রুকু' একটি 'ইবাদাত। তার পূর্ণতাই হলো নিজেকে হীন, নীচ ও তুচ্ছভাবে উপস্থাপন করা। নিজের বড়ত্ব অন্তর থেকে বের করে আল্লাহ্র ভয় ও ওহদানিয়াত (একত্ববাদ) সেখানে প্রতিস্থাপন করা। কোনো অন্তরে যখন আল্লাহ্র ভয় ঢুকে পড়ে, তখন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যে কোনো কিছুর ভয় সেখান থেকে বেরিয়ে যায়। অতএব, রুকু'তে যে যত বেশি তাসবীহ পাঠ করবে, বিনয়ী হবে, আল্লাহ্র ভয় তার ভেতর তত বেশি শক্তিশালী হবে। এই-ই হলো রুকু'র হাকীকত, রুকু'র বাস্তবতা।

রুকু'র এই অবস্থা আল্লাহ্র খুব প্রিয়। তাই বান্দা বেশি বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। হামদ (আল্লাহ্র প্রশংসা) করবে। 'সুবহানা রব্বিয়াল আযীম' পড়বে। কেননা, আল্লাহ্ই তাকে রুকু' করার তাওফীক দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাওফীক দিয়েছেন বলেই সে 'ইবাদাতের সৌভাগ্য অর্জন করেছে। অথচ কত মানুষ এই তাওফীক থেকে বঞ্চিত।

## ‘কওমা’ একটি ‘ইবাদাত

‘কওমা’ বলা হয় রুকু’ ও সিজদার মধ্যবর্তী সময় সোজা হয়ে দাঁড়ানোকে। অতঃপর রুকু’কারী রুকু’ করে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে। আল্লাহর সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াবে, যেভাবে কির’আত পাঠের সময় দাঁড়িয়ে ছিল। তার প্রশংসা স্তুতি করবে, যেভাবে কির’আতের শুরুতে করেছিল।

কওমাও একটি বিশেষ ‘ইবাদাত। এটি রুকু’-সিজদার মতোই সালাতের অন্যতম একটি রুকন। এর সুাদ ও মজা একদম ভিন্ন। যা কেবল সালাত আদায়কারীই তার অন্তরে অনুভব করতে পারে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কওমাকে রুকু’-সিজদার মতো প্রলম্বিত করতেন। স্থির দাঁড়িয়ে থাকতেন, এবং খুব বেশি হামদ-সানা পাঠে ব্রত হতেন। যেমনটা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাহাজ্জুদের সালাতে রুকু’ থেকে দাঁড়ানো অবস্থায় তিনি বলতেন—

لِرَبِّي الْحَمْدُ لِرَبِّي الْحَمْدُ

প্রশংসা আমার প্রতিপালকের জন্যই... প্রশংসা আমার প্রতিপালকের জন্যই..  
এভাবে বার বার বলতে থাকতেন[১৮]

## ‘সিজদা’ একটি ‘ইবাদাত

অতঃপর বান্দা তাকবীর বলতে বলতে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে। প্রতিটি অঙ্গকে এই ‘ইবাদাতের’ শামিল করবে। আল্লাহর সম্মুখে কপাল রাখবে। মাটির সাথে চেহারা লাগাবে। নাক ধূলি-ধূসরিত করবে। মানুষের অঙ্গসমূহের মধ্যে চেহারা হলো সর্বোচ্চ সম্মানের। সেটাকে সর্বস্রষ্টার সম্মুখে বিছিয়ে দেবে। বিশেষ করে হৃদয়। এছাড়া চেহারার সাথে সাথে অন্তরকেও সিজদা করাবে। মনে রাখতে হবে, অন্তর এবং অঙ্গসমূহের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সম্মান প্রকাশের নামই সিজদা। তাই দেহ যেভাবে আল্লাহকে সিজদা করে, তদ্রূপ অন্তরকেও তার প্রতিপালকের সামনে সিজদাবনত করবে। আর একই সাথে সিজদাবনত করবে নাক, মুখ, হাত, হাঁটু, মাথা ও পা। আর সিজদারত অবস্থায় উরু পায়ের গোড়ালির উপরের অংশ থেকে পৃথক রাখবে। একইভাবে পেট, উরু থেকে, বাহু তার পার্শ্ব থেকে পৃথক রাখবে।



যাতে প্রতিটা অঙ্গ থেকে পৃথক পৃথক 'ইবাদাত প্রকাশ পায়।

বান্দা নিজেকে হীন, নীচ, তুচ্ছ, ভুখা-নাঙ্গা, ভিক্ষুকের মতো পেশ করবে। অহংকার ও অহমিকা ধুলোয় মিশিয়ে দেবে। তার বড়ত্বের সামনে নিজের অসহায়ত্ব, 'ইবাদাতের সামনে নিজের সম্মানহীনতা ফুটিয়ে তুলবে। মালিকের সামনে একজন দাসের দাসত্ব প্রকাশের সর্বোচ্চ মাধ্যম হলো এই সিজদা। এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে বেশি নৈকট্য লাভ করে। যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

যে কাজের দ্বারা বান্দা আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী হয়, সেটা হলো সিজদা।<sup>[২০]</sup>

সালাত আদায়কারীর সিজদা যখন পূর্ণ খুশু-খুযু সাথে হবে, তখন এই এক সিজদার কিয়ামাত পর্যন্ত কাটিয়ে দেওয়া সম্ভব! একবার সাহল ইবনু 'আদিল্লাহ ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হৃদয়ও কি সিজদা করে? তিনি বলেছিলেন 'অবশ্যই'! আল্লাহর কসম! কেউ যদি খুশু-খুযু সাথে সিজদা করার মজা পেয়ে যেত, তাহলে কিয়ামাত পর্যন্ত সে আর তার মাথা তুলতেই চাইত না।<sup>[২১]</sup> এই সিজদার রহস্য হলো, অন্তরের অহমিকা মিটিয়ে দেওয়া। নিজেকে ছোট ও তুচ্ছ জ্ঞান করা। বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা। লোকালয়ে বা লোকশূন্যে সর্বাবস্থায়, সকল স্থানে, আল্লাহর ধ্যান ও খেয়াল অন্তরে চালু রাখা।

### সালাতের পাঁচ রুকন

সালাতের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কির'আত, কিয়াম, রুক', সিজদা ও যিক্র। প্রত্যেকটি দ্বারাই সালাতের নামকরণ করা যায়। যেমন : কুর'আনে সালাতকে কখনো 'কিয়াম' বলা হয়েছে।

فَمِ النَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا

রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর সালাতে দাঁড়াও।<sup>[২২]</sup>

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

- ১৯ সহীহ মুসলিম, ৪৮২; আবু দাউদ, ৮৭৫  
২০ মাজমাউল ফাতওয়া, ২১/২৮৭  
২১ সূরা মুযাযিল, ৭৩ : ০২

আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও।<sup>[১১]</sup>

কখনো ‘কির’আত’ নামে অবহিত করা হয়েছে।

وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

...আর ফজরের সালাতে কুর’আন পাঠ করো। নিশ্চয়ই ফজরের সালাতের কুর’আন পাঠ সাক্ষীস্বরূপ।<sup>[২০]</sup>

فَاَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

কাজেই কুর’আনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু তিলাওয়াত করো।<sup>[২৪]</sup>

কখনো রুকু’ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

وَاذْكُرُوا مَعَ الرُّكُعِينَ

এবং তোমরা রুকু’কারীদের সঙ্গে রুকু’ করো।<sup>[২৫]</sup>

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اذْكُرُوا لَا يَذْكُرُونَ

যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহর সম্মুখে নত হও (সালাতে দাঁড়াও), তখন তারা নত হয় না।<sup>[২৬]</sup>

সালাতকে ‘সিজদা’ বলা হয়েছে।

۞ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

১১ সূরা বাকারাহ, ০২ : ২২৮  
২০ সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ৭৮  
২৪ সূরা মুযাশ্বিল, ৭৩ : ২০  
২৫ সূরা বাকারাহ, ০২ : ৪৩  
২৬ সূরা মুরসালাত, ৭৭ : ৪৮



তুমি সিজদা (সালাত) করো। আর (আল্লাহর) নৈকট্য লাভ করো।<sup>[২৭]</sup>

আবার কখনো ‘যিক্র’ (স্মরণ) বলে সালাত বোঝানো হয়েছে।

فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

আল্লাহর স্মরণের দিকে (সালাত) শীঘ্র ধাবিত হও, ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ করো, এটাই তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা জানতে।<sup>[২৮]</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

হে মু’মিনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ (সালাত) হতে যেন বিমুখ না করে। যারা এ কারণে বিমুখ হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।<sup>[২৯]</sup>

এসব আয়াত সালাতের রুকন হওয়ারও দলিল।

সালাতের সর্বোত্তম রুকন হলো সিজদা। সর্বোত্তম যিক্র তিলাওয়াত। প্রথম যে সূরা অবতীর্ণ হয়, (সূরা ‘আলাক’) তার শুরুটা ছিল ‘ইকরা’। অর্থ, পড়ো তোমার প্রভুর নামে। আর শেষটা ছিল—

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

আপনি সিজদা করুন ও আমার নৈকট্য অর্জন করুন।<sup>[৩০]</sup>

তিলাওয়াত দিয়ে শুরু, সিজদা দিয়ে শেষ। প্রতিটা রাক্‘আতের ভিত্তিও এর ওপর। অর্থাৎ, তিলাওয়াত দ্বারা সূচনা, সিজদা দ্বারা সমাপ্ত।

২৭ সূরা আলাক, ৯৬ : ১৯; আয়াতটির তিলাওয়াতকারীর জন্য সিজদা করা আবশ্যিক।

২৮ সূরা জুমু’আ, ৬২ : ০৯

২৯ সূরা মুনাফিকুন, ৬৩ : ০৯

৩০ সূরা আলাক, ৯৬ : ১৯; আয়াতটির তিলাওয়াতকারীর জন্য সিজদা করা আবশ্যিক।

## ‘জলসা’ (বৈঠক) একটি ‘ইবাদাত

অতঃপর সিজদা থেকে তাকবীর বলে মাথা ওঠাবে। স্থিরতার সাথে সোজা হয়ে বসবে। এটাকে বলে ‘জলসা’। এটা পৃথক একটি ‘ইবাদাত, যা দুই সিজদা দ্বারা বেষ্টিত। তার আগেও সিজদা, পরেও সিজদা। এটি এক সিজদা থেকে উঠে আরেক সিজদায় যাওয়ার পূর্বমুহূর্ত এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অবস্থা। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জলসায় সিজদা পরিমাণ সময় বিলম্ব করতেন। খুশ-খুশর সাথে দু‘আ করতেন। ক্ষমা চাইতেন। রাহমাত, হিদায়াত, ‘আফিয়াত ও উত্তম রিয়ক কামনা করতেন। এই জলসার স্বাদ ও মজা একদম ভিন্ন।

বান্দার এই বসার সাদৃশ্য হলো বাদশাহর সামনে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির হাঁটু গেড়ে বসার মতো, যে কিনা অনুনয়-বিনয় করতে থাকে যেন বাদশাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। কাকুতি মিনতি করতে থাকে, যেন তিনি তার ওপর দয়ার দৃষ্টি ফেলেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জলসাতে খুব বেশি বেশি ইস্তিগফার করতেন—

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

হে আল্লাহ্, আমাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ্, আমাকে ক্ষমা করুন।<sup>(১)</sup>

এবং খুব ভীতসন্ত্রস্ত থাকতেন। হে ‘ইবাদাতকারী, সালাতে নিজের নাফসকে এমন ব্যক্তির অবস্থায় চিন্তা করুন, যে ঋণগ্রহীতা। আর আপনি হলেন ওই ঋণের যামিনদার। অতঃপর ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে টালবাহানা এবং প্রতারণার আশ্রয় নিলে উক্ত ঋণ পরিশোধের চাপ আপনার নিজের ওপর আসে। ফলে আপনার সমস্ত শক্তির সদ্যবহার করে আপনি ঋণগ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের জন্য চাপ প্রয়োগ করেন, যাতে যামিন হওয়া থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন।

এই উপমাটির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য—এই বিষয়টি পরিষ্কার করা যে, একজন ব্যক্তির উচিত তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ লভ্য সকল উপায় অবলম্বন করে সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগানো, যাতে সে তার সালাতের যথাযথ এবং পূর্ণাঙ্গ আদায় নিশ্চিত করতে সামর্থ্য হয়।



ভালো-মন্দ, প্রশংসা-তিরস্কার, পুরস্কার-শাস্তি এমন ব্যাপারে ফল ও নফস একে অপরের একনিষ্ঠ সঙ্গী। নাকসের সহজাত বৈশিষ্ট্যই হলো অসহন। নফস বিদ্রোহী হয়ে ওঠা, প্রতিনিয়ত আল্লাহর দাসত্ব থেকে বেঁচে হতে চাওয়া, 'ইবাদাত থেকে দূরে থাকা, আল্লাহর হুকুম, এমনকি অন্যান্য নবীর হুকুম না

নাকস শক্তিশালী হয়ে উঠলে তার প্রভাব অত্যন্ত বেড়ে বড়। ফল ফল হতে অনুগত হয়ে পড়ে। আবার বিপরীতভাবে কল্‌বের প্রভাব ও শক্তি বেড়ে যায়। নাকস তখন কল্‌বের অধীনে চলে আসে। দুতরাং বাকসর জন্য অসহন হয়। যখন সে নিজদা থেকে মাথা ওঠাবে, প্রভুর নামনে অপরাধীর নতাই হুঁ সাজ বসবে। নাকসের বিপরীতে আল্লাহর নিকট দাহব্য চাইবে। অতীত-ভুলের জন্য অনুতপ্ত হবে, এবং বড় আশা, আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এই দু'আটি পড়বে—

اللَّهُمَّ اغْنِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَغَاثِنِي وَأَرْزُقْنِي

হে আল্লাহ্, আপনি আমাকে ক্রমা করুন। রাহমাত বর্ষণ করুন। নিরাপত্তা রক্ষা  
হিদায়াত নাসীব করুন। উত্তম রিয়কের ব্যবস্থা করুন।

ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু  
'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই সিজদা'র মাঝে এ দু'আ পড়তেন। আর এই দু'আ  
তে উল্লেখিত পাঁচটি জিনিস এমন—যাতে দুনিয়া ও 'আখিরাতের সমস্ত ক্ষয়  
অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। মানুষ দুনিয়া ও 'আখিরাতের কল্যাণ চায়। অন্য  
থেকে বাঁচতে চায়। আর এই দু'আটিতে এর সবই রয়েছে।

হালাল রিয়ক হলো তা—যা দুনিয়া ও 'আখিরাতে কল্যাণ বয়ে আনে। রিয়ক  
সাধারণত তিন প্রকার। শরীরের রিয়ক। অন্তরের রিয়ক। আত্মার (বা নাকস) রিয়ক  
আর আল্লাহ্ হলেন সর্বোত্তম রিয়কদাতা।

আফিয়াত : মানে নিরাপত্তা। যা সকল অনিষ্ট, অনিরাপত্তা এবং ভয়-ভীতি দূর করে।

হিদায়াত : অর্থ সঠিক পথের দিশা। এই হিদায়াতই পরকালের চূড়ান্ত সফলতা।

মাগফিরাত : ভূত-ভবিষ্যতের সকল পাপের মার্জনা। দুনিয়া ও 'আখিরাতের সমস্ত  
প্রকার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা।

রাহমাত : এটির পরিসীমা এতই ব্যাপক যে, উল্লিখিত চারটি বিষয়ই এতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

এই দু'আ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায় জলসাতেই পড়তেন। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত আছে। ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল আছে। প্রতি সালাতে দুই, তিন কিংবা চারটি করে জলসা থাকে। কোনো জলসায় যদি একবার এই দু'আটি রুকূল হয়ে যায়, তাহলে সালাত আদায়কারীর জন্য এর চেয়ে বড় সফলতা আর কী হতে পারে?

### দ্বিতীয় সিজদার মাহাত্ম্য

অতঃপর বান্দা তাকবীর বলে দ্বিতীয় সিজদায় যাবে। যেভাবে খুশু-খুযু সাথে প্রথম সিজদা করেছিল, দ্বিতীয় সিজদাও ঠিক সেভাবে আদায় করবে। রুকু'র মতো এক সিজদায় রাক'আত পূর্ণ হয় না। দুটি সিজদা আদায় করতে হয়। এটিই সিজদার বৈশিষ্ট্য, শ্রেষ্ঠত্ব। মনে রাখা জরুরী যে, সালাতের অন্যান্য রুকনের মধ্যে সিজদা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এমন—যেন এটাই সালাতের মূল, বাকি সব হলো তার ভূমিকা।

সিজদা বান্দাকে আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগ প্রদান করে। সালাতে সিজদার মর্যাদা হলো হজে তাওয়াফের মর্যাদার মতো। তাওয়াফে যিয়ারত দ্বারা হাজী যেমন আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে, অনুরূপ সালাত আদায়কারীও সিজদার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। তাওয়াফ আর সিজদা প্রায় একই।

একবার কেউ 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু 'আনহু-কে তার কন্যার জন্য বিয়ের প্রস্তাব দিলেন, তখন তিনি তাওয়াফে ছিলেন। তাওয়াফ শেষে বললেন, 'তুমি আমাকে দুনিয়ার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছ, অথচ আমি তাওয়াফে আমার আল্লাহকে দেখছিলাম।' [৩৩]

এই জন্য সিজদাকে রুকু'র পরে রাখা হয়েছে। যেন বান্দা শ্রেষ্ঠ রুকন থেকে শ্রেষ্ঠতর রুকনের দিকে ধাবিত হতে পারে।

বান্দা দ্বিতীয় সিজদা করবে। প্রথম সিজদায় যা যা করেছে, দ্বিতীয় সিজদায় তার পুনরাবৃত্তি করবে। দ্বিতীয় সিজদা হলো আত্মার খোরাক। সুতরাং দ্বিতীয়বার সিজদা



করাটা হলো খাদ্য আর পানির মতো। এক লোকমার পর আরেক লোকমা খেলে যেমন মানুষ তৃপ্ত হয়, এক ঢোকের পর আরেক ঢোক পান করলে যেমন তৃষ্ণা মেটে, তেমনই সালাত আদায়কারী এক সিজদার পর আরেক সিজদার দ্বারা আত্মতৃপ্তি লাভ করে।

যদি কোনো ক্ষুধার্তকে এক লোকমা খেতে দেওয়ার পর তার সামনে থেকে খাদ্যপাত্র সরিয়ে ফেলা হয়, তখন সে পরবর্তী লোকমার জন্য কেমন করবে? এতে কি তার ক্ষুধা মিটবে না বাড়বে? এ কারণে কোনো এক ইমাম বলেছিলেন, ‘যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে কিন্তু অন্তরে প্রশান্তি পায় না, তার দৃষ্টান্ত হলো ওই ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মতো যাকে খাবার দেওয়া হয়েছে আর সে কেবল এক লোকমাই খেতে পেরেছে।’ এমন ব্যক্তি তো পরবর্তী লোকমার জন্য অস্থির ও মরিয়া হয়ে উঠবেই।

বলা যায়, এটা প্রথম সিজদার শুকরিয়াস্বরূপ। অধিক কল্যাণ ও ‘ইমানিয়াত অর্জনের উপায়। এতে অন্তর আলোকিত হয়। প্রাণবন্ত হয়। হৃদয় প্রশান্ত হয়। অন্তরের পঙ্কিলতা, সংকীর্ণতা বিদূরিত হয়। অনেকটা কাপড় ধোয়ার মতো। একবার ধোয়ার পর আরেকবার ধোয়ার দ্বারা যেমন অধিক পরিষ্কার হয়, তেমন দ্বিতীয় সিজদার বেলাতেও। একবার সিজদা দেওয়ার পর দ্বিতীয়বারে অন্তর আরও প্রশান্ত হয়। আরও বিগলিত হয়।

এটি আল্লাহর বিশেষ কৌশল—যা সালাত আদায়কারীর অন্তর উজ্জ্বল করে তোলে। তাঁর রাহমাত ও লুতফের (গুঢ় রহস্য) দিকে ধাবিত করে। এর চেয়ে বেশি আমরা তাঁর হিকমাহর কী-ই বা ব্যাখ্যা দিতে পারি—যা আমাদের জ্ঞান-পরিধির বাইরে?

### ‘তাশাহহুদ পাঠ’ একটি ‘ইবাদাত

যখন বান্দা সালাত প্রায় শেষ করে ফেলবে, তার সব রুকন আদায় হয়ে যাবে, তখন সে প্রভুর সামনে আদবের সাথে বসবে। তার প্রশংসা করবে। তাঁর এমনসব প্রশংসা করবে—যার জন্য একমাত্র তিনিই উপযুক্ত। অতএব, এ সময় বান্দার জন্য তাশাহহুদ পড়াই উত্তম। কেননা, তাতে প্রশংসা আছে। সালামও আছে। যে প্রশংসা ও সালামের একমাত্র উপযোগী সত্তা তিনি। সেই তাশাহহুদ ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস’উদ রা. বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, দুই রাক‘আত সালাত আদায়ের পর বসে যা পাঠ করতে হবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের তা শিক্ষা দিয়েছেন—

## ৬৬

الْحَيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا  
وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

সমস্ত সালাম, অভিবাদন, সালাত, দু‘আ এবং পবিত্রতা মহান আল্লাহর জন্য।  
হে নাবী, আপনার ওপর সালাম, আল্লাহর রাহমাত ও কল্যাণ বর্ষিত হোক।  
আমাদের ও আল্লাহর সকল নেক বান্দার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য  
দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি  
যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

### ‘আস্তাহিয়াতু’ (الْحَيَّاتُ) অর্থ সম্ভাষণ। অভিবাদন।

দুনিয়ার নিয়ম হলো—কথা ও কর্ম দ্বারা, বিনয় ও নম্রতার সাথে বিভিন্নভাবে  
রাজা-বাদশাহদের প্রতি সালাম পেশ করা। অভিবাদন জানানো। কখনো স্তুতিবাক্য  
উপস্থাপন করে, কখনো রাজ্য ও রাজত্বের স্থায়িত্ব কামনা করে।

তাদের কাউকে শুধু স্তুতিবাক্য ও কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে অভিবাদন জানানো হয়।  
আবার কাউকে জানানো হয় কেবল সিজদা করে এবং রাজা ও রাজ্যের স্থায়িত্ব  
কামনার মাধ্যমে।

আর কোনো রাজা আছে এমন, যাকে অভিবাদনের জন্য যত ধরন ও প্রচলন থাকতে  
পারে—তার সবই তার সমীপে উপস্থাপন করতে হয়। সিজদা করা, গীত গাওয়া,  
রাজা ও রাজ্যের অমরত্ব চাওয়া ইত্যাদি। সুতরাং الْحَيَّاتُ ‘আস্তাহিয়াতু’ মানে হলো  
রাজার জন্য, রাজ্য ও রাজত্বের জন্য কল্যাণ কামনা করে অভিবাদন জানানো।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলাই হলেন প্রকৃত বাদশাহ। তিনি অমর। তিনি  
চিরঞ্জীব। তাঁর রাজত্বও চিরন্তন এবং চিরস্থায়ী। অতএব, সিজদা, প্রশংসা ও স্থায়িত্ব  
কামনাসহ অভিবাদন জানানোর যত মাধ্যম হতে পারে, তাঁর সব কিছুর উপযুক্ত  
একমাত্র সত্তা তিনিই।

الْحَيَّاتُ এর শুরুতে আলিফ-লাম যুক্ত করা, এবং শব্দটিতে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে  
ব্যাপকতা বোঝানোর জন্য। অর্থাৎ, অভিবাদনের যাবতীয় প্রকার শুধু আল্লাহর জন্য।



التَّحِيَّاتُ এটা تَكْرِيمَةٌ এর আদলে। তার প্রকৃত রূপ ছিল نَحْيٌ। অতঃপর উচ্চারণ সহজীকরণে তাতে 'আরবী ব্যাকরণ তথা সরফী কায়দা প্রয়োগ করা হয়েছে। কসে তَحْيٍ এর বহুবচন হলো تَحِيَّاتٌ। এই تَحِيَّاتٌ/التَّحِيَّاتُ মূল ধাতু বা উৎপত্তিস্থল হলো حَيَاةٌ অর্থ : জীবন। প্রাণ। সুতরাং التَّحِيَّاتُ 'আন্তাহিয়াতু' দ্বারা উদ্দেশ্য হবে 'কারও জন্য অমরত্ব কামনা করে অভিবাদন জানানো।' যেমনটা সচরাচর বাদশাহদের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে : আপনি দীর্ঘজীবী হোন, হাজার বছর বেঁচে থাকুন ইত্যাদি। আবার কেউ বলে অমুক রাজা জিন্দাবাদ... এসবই কিন্তু التَّحِيَّاتُ 'আন্তাহিয়াতু'।

সুতরাং হায়াত ও রাজত্বের অমরত্ব কামনায় যত প্রকারের অভিবাদন হতে পারে, সবই প্রয়োগ হবে কেবল সেই সত্তার জন্য, যিনি চিরঞ্জীব। কখনোই যার মৃত্যু আসবে না। যিনি রক্ষণাবেক্ষণকারী। কখনোই তন্দ্রা ও নিদ্রা যাকে স্পর্শ করে না। তিনি ছাড়া আর যা কিছু আছে, সব লয় ও ক্ষয়প্রাপ্ত। ধ্বংস অনিবার্য। স্থায়ী শুধু তিনি আর তাঁর রাজত্ব।

'আন্তাহিয়াতু'র (التَّحِيَّاتُ) পরের শব্দ হলো 'আসসালাওয়াতু' (السَّلَامَاتُ)। অর্থ : 'ইবাদাত, আরাধনা। শব্দটি 'আন্তাহিয়াতু'-এর সাথে আত্ফ বা মিলিয়ে আনা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহর জন্য আন্তাহিয়াতু যেমন আবশ্যিক তেমনি 'আসসালাওয়াত'ও এবং শব্দটিকে আলিফ-লামসহ বহুবচনে উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে করে সকল প্রকার সালাত, 'ইবাদাতে' শামিল হয়ে যায়। সুতরাং যাবতীয় 'ইবাদাত কেবল তার জন্য। অন্য কারও জন্য নয়। 'আন্তাহিয়াতু' হলো তাঁর রাজত্বের কারণে। 'আসসালাওয়াতু' হলো তার উপাসনা হিসেবে। 'আন্তাহিয়াতু' এবং 'আসসালাওয়াতু'-এর একমাত্র উপযুক্ত তিনিই।

### আন্তায়িবাৎ

'আন্তাহিয়াতু' এবং 'আসসালাওয়াতু'-এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে আরও এক শব্দ। সেটি হলো 'আন্তায়িবাৎ' (الطَّيِّبَاتُ)। অর্থ : পবিত্র, উত্তম। ব্যাপকতা বোঝানোর জন্য এখানেও আলিফ-লাম ও বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। 'আন্তায়িবাৎ'-এর দুটি দিক রয়েছে। এক, গুণগত পবিত্রতা বোঝায়। দুই, সত্তাগত পবিত্রতা বোঝায়।

সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র। তার কথাসমূহ পবিত্র। তার সকল কর্ম পবিত্র। তার থেকে যা প্রকাশ পায় তা পবিত্র। তার দিকে যা সম্পৃক্ত করা হয় তাও পবিত্র। যেমন : বাইতুহু (তার ঘর), আবদুহু (তার বান্দা), রূহুহু (তার রূহ),

নাকতুহু (তার উটনী), আমাতুহু (তার জামাত) এসব কিছু পবিত্র। পবিত্র ‘আমালই তার কাছে গৃহীত হয়। সুতরাং তার সিফাত, কথা, কর্ম ও সম্পত্তি পবিত্র।

এই ‘আস্তিয়াবাত’-এর মাঝে রয়েছে তার তাসবীহ, হামদ, তাকবীর, বড়ত্ব-মহত্ব, নি‘য়ামাত ও গুণাবলির ওপর যত বাক্য হতে পারে সব এবং এমন সব কালাম, যাতে রয়েছে তাওহীদ ও একত্ববাদের সাক্ষ্য। যেমন :

৫৫

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

হে আল্লাহ, আপনি পাক-পবিত্র, আপনার জন্যই সকল প্রশংসা, আপনার নাম পবিত্র এবং বরকতময়, আপনার গৌরব অতি উচ্চ, আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ

আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। তিনি মহান।

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

আমরা আল্লাহর প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, মহান আল্লাহ যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে অতি পবিত্র।

এমন আরও অনেক বাক্য রয়েছে। মোটকথা, তিনি এক পবিত্র সত্তা। তিনি বান্দাদের পবিত্র উপাস্য। তাদের প্রতিপালক। জামাতে তিনি তাদের প্রতিবেশী।

### কুর’আনের পর সর্বোত্তম বাক্য

কুর’আনের পর সর্বোত্তম বাক্য হলো, ‘সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদু লিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওল্লাহু আকবার ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ...’

কেনইবা তা সর্বোত্তম বাক্য হবে না? এর প্রতিটি অংশে রয়েছে আল্লাহর স্তুতি, তাওহীদের সীকৃতি। একটু চিন্তা করলেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। যেমন :



‘সুবহানাল্লাহ্’ অর্থ : আল্লাহ্ তা‘আলা পবিত্র। যাবতীয় মানবীয় গুণাবলি, দোষ-ত্রুটি, এবং সাদৃশ্য থেকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র। ‘আলহামদু লিল্লাহ্’ অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তিনি কথা, কর্ম ও গুণগত দিক দিয়ে সুষংসম্পূর্ণ। সর্বদিক দিয়ে পরিপূর্ণ। তার এই পূর্ণতা ভূত-ভবিষ্যৎ ও সর্বকালে চিরন্তন।

‘লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্’ অর্থাৎ, তিনি একমাত্র ইলাহ। তিনিই একমাত্র মা‘বুদ। তিনি ছাড়া সব ইলাহ ভ্রান্ত। ‘ইবাদাতের তিনিই একমাত্র উপযুক্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করে, তার দৃষ্টান্ত হলো ওই ব্যক্তির মতো যে মাকড়সার জাল দিয়ে ঘর বানায়। শীত ও গ্রীষ্মে, বর্ষা ও বিপদে, দুর্যোগ ও দুর্ভোগে তাতে আশ্রয় নেয়। অথচ এটি তার জন্য কোনো উপকারই বয়ে আনতে পারে না।

‘আল্লাহু আকবার’ অর্থ : তিনি মহান। তিনি সব কিছু থেকে মহান। সম্মানিত, ক্ষমতাধর, পরাক্রমশালী, রক্ষণাবেক্ষণকারী, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। এমন অর্থবহ অতি উত্তম বাক্যের তিনিই একমাত্র উপযুক্ত।

## নাবী ও সালিহীনদের প্রতি সালাম

السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَالصَّالِحِينَ وَالطَّيِّبَاتِ

সালাম, অভিবাদন, সালাত, দু‘আ এবং পবিত্রতা—সবকিছু মহান আল্লাহর জন্য।  
বলার পর বলবে,

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

হে নাবী, আপনার ওপর সালাম, আল্লাহর রাহমাত ও কল্যাণ বর্ষিত হোক।  
আমাদের ও আল্লাহর সকল নেক বান্দার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

এভাবে সকল নেককার লোকের ওপর সালাম পেশ করবে—যারা আল্লাহর মনোনীত বান্দা।  
তিনি কুর‘আনে নিজের হামদের পরেই তাদের প্রতি সালাম প্রেরণের কথা উল্লেখ করেছেন—

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ۚ ءَلَلَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ

বলো, যাবতীয় প্রশংসাই আল্লাহর এবং সালাম ও শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাগণের ওপর! (বলো) শ্রেষ্ঠ কে? আল্লাহ, না ওরা যাদেরকে তারা শরীক সাব্যস্ত করে।<sup>৩৪</sup>

এখানে তিনি উপমা টেনে বুঝিয়ে দিলেন। এখানে সৎকর্মপরায়ণদের প্রশংসা করা হয়েছে। তার মানে, স্রষ্টার পর সৃষ্টির প্রশংসা ও অভিবাদন জানানো শারী‘আতসম্মত।

সৃষ্টির মধ্যে সর্বাত্মে সালাম পেশ করা হবে সর্বোত্তম মানব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি। যার বারকাতে, ত্যাগ ও কুরবানীতে আমরা ইসলাম পেয়েছি। শেষ উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি। অতঃপর অন্যান্য নাবী ও ফেরেশতাকুলের ওপর। এরপর তাদের অনুসারী সাহাবী ও সলিহীনগণের ওপর সালাম পেশ করবে এবং সালাম পেশ করবে সাধারণ বিশ্বাসীদের ওপর।

### কালিমায়ে শাহাদাতাইনের মর্ম

এরপর কালিমায়ে শাহাদাতাইন পড়বে—

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

...আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল।

এটি তাশাহহুদের শেষ বাক্য। কালিমায়ে শাহাদাতে দুটি অংশ রয়েছে। একটি হলো তাওহীদে বিশ্বাস, অন্যটি হলো রিসালাতের সাক্ষ্য। এর ওপরই সালাতের ভিত্তি, এবং এই কালেমার একটি দাবীই হলো সালাত প্রতিষ্ঠা করা।

এই কালিমা দ্বারা বোঝা যায়, নুবুওয়্যাতের সাক্ষ্য দেওয়া ছাড়া শুধু তাওহীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

কালিমায়ে শাহাদাতাইনের মাধ্যমে সালাতের সমাপ্তি হয়। ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—





وَأَذَلَّتْ هَذَا أَوْ قُضِيَتْ هَذَا فَقَدْ قُضِيَتْ صَلَاتُكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ

...যখন তুমি এ দু'আ (তশাহুদ) পড়বে অথবা পড়া শেষ করবে তখন তোনার সালাত শেষ হবে। এরপর তুমি চাইলে উঠে যাবে নতুবা বসে থাকবে।

আন্তাহিয়াতু পড়ার দ্বারা সালাত পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়। এমনটিই ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুলাহ-এর মত। অন্যান্যদের মতেও, সালাত তখন সমাপ্তের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। মোটকথা, উভয় মত অনুসারেই কালিমায়ে শাহাদাতের দ্বারা সালাত পরিপূর্ণ হয়ে যায়। যেভাবে ওয়ু এবং জীবনের সমাপ্তিও কালিমার মাধ্যমে হওয়াই উত্তম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—



যে ব্যক্তির জীবনের শেষ বাক্য হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

### নাবীর ওপর দরুদ পড়ার রহস্য

সালাত শেষ। এরপর সালাত আদায়কারী প্রার্থনা করবে। নিজের প্রয়োজনের কথা আল্লাহর নিকট উত্থাপন করবে। এর জন্য উত্তম পদ্ধতি হলো আল্লাহ তা'আলার হামদ (প্রশংসা) করা এবং রাসূল সাল্লাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর দরুদ পাঠ করা, যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ফুযালা ইবনু 'উবায়দ রাযিআল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—



যখন তোমাদের কেউ প্রার্থনা করবে, তখন সে যেন প্রথমে আল্লাহর হামদ (প্রশংসা) করে। সানা পাঠ করে, এবং তাঁর রাসূলের ওপর দরুদ পাঠ করে। অতঃপর যা তার প্রয়োজন—তা চেয়ে নেয়।

৩৫ আবু দাউদ, ৯৭০; মুসনাদে আহমাদ, ১/৪২২

৩৬ আবু দাউদ, ৩১১৬; মুসনাদে আহমাদ, ৫/২৩৩

৩৭ আবু দাউদ, ১৪৮১; তিরমিযী, ৩৪৭৭

দরুদ পড়ার পর সে প্রার্থনা করবে (দু'আ মাসূরা পড়বে)। আর দু'আই হলো সালাতের সীলমোহর।

সূতরাং 'আন্তাহিয়াতু'তে রয়েছে আল্লাহর হামদ ও সানা। এরপর রাসূলের ওপর দরুদ। সর্বশেষ দু'আ। আর নাবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অনুমতি দিয়েছেন যে, সালাতের পর সে যা ইচ্ছা চাইতে পারে।

### 'আযানের সুনাতসমূহ

যে ব্যক্তি 'আযান শুনতে পাবে, তার জন্য পাঁচটি কাজ রয়েছে।

এক. মুআযযিন যা বলবে, জবাবে হুবহু তাই বলবে।<sup>[৩৮]</sup>

দুই. দরুদ পড়বে।<sup>[৩৯]</sup>

তিন. নাবীর মর্তবা ও মর্যাদাবৃন্দির প্রার্থনা করবে।<sup>[৪০]</sup>

৩৮ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা 'আযান শুনতে পাও তখন মুআযযিন যা বলে তোমরাও তাই বলবে। সহীহ বুখারী, ৬১১; সহীহ মুসলিম, ৩৮৩

বি.দ্র. 'আযানের পূর্ণাঙ্গ জবাব মুসলিমের ৭৩৬ নং হাদীসে বিস্তারিতভাবে এসেছে। 'উমার ইবনুল খাতাব রায়িল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুআযযিন যখন 'আল্লাহু আকবার', 'আল্লাহু আকবার' বলে তখন তোমাদের কোনো ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে তার জবাবে বলে, 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার'। যখন মুআযযিন বলে, 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর জবাবে সেও বলে, 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। অতঃপর মুআযযিন বলে, 'আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' এর জবাবে সে বলে, 'আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'। অতঃপর মুআযযিন বলে, 'হাইয়া 'আলাস সলাহ'- এর জবাবে সে বলে, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'। অতঃপর মুআযযিন বলে, 'হাইয়া 'আলাল ফালাহ' এর জবাবে সে বলে, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'। অতঃপর মুআযযিন বলে, 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' এর জবাবে সে বলে, 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার'। অতঃপর মুআযযিন বলে, 'লা ইলাহা ইল্লালহ' এর জবাবে সে বলে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। 'আযানের এ জবাব দেওয়ার কারণে সে জান্নাতে যাবে।

৩৯ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস রায়িল্লাহু 'আনহু নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনছেন, তোমরা যখন মুআযযিনকে 'আযান দিতে শোন, তখন সে যা বলে তোমরা তাই বলো। অতঃপর আমার ওপর দরুদ পাঠ করো। কেননা, যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার ওপর দশবার রাহমাত বর্ষণ করেন। অতঃপর আমার জন্য আল্লাহর কাছে ওয়াসীলাহ প্রার্থনা করো। কেননা, 'ওয়াসীলাহ' জান্নাতের একটি সম্মানজনক স্থান। এটা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজনকেই দেওয়া হবে। আমি আশা করি, আমিই হব সে বান্দা। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আমার জন্য ওয়াসীলাহ প্রার্থনা করবে তার জন্য (আমার) শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে যাবে। সহীহ বুখারী, ৭৩৫

৪০ 'আযান শোনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দু'আটি পড়তে বলেছেন :

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ النَّاتِيَةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الرَّسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ



চার. বলবে—

৫৫

رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا

আমি রব হিসেবে আল্লাহকে, জীবন বিধান হিসেবে ইসলামকে এবং নাবী হিসেবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পেয়ে সন্তুষ্ট।<sup>[৪১]</sup>

পাঁচ. এরপর আল্লাহর কাছে যা ইচ্ছে চাইবে।<sup>[৪২]</sup>

মুআযযিনের ‘আযানের জবাবে এই হলো পাঁচটি সুন্নত। এক্ষেত্রে অলসতা করা উচিত নয়।

হে আল্লাহ্-এ পরিপূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের আপনিই মালিক, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ওয়াসীলাহ্ ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী করুন এবং তাঁকে সে মাকামে মাহমুদে পৌঁছে দিন যার অঙ্গীকার আপনি করেছেন’—কিয়ামাতের দিন সে আমার শাফা’আত লাভের অধিকারী হবে। সহীহ বুখারী ৬১৪

৪১ সা’দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : মুআযযিনের ‘আযান শুনে যে ব্যক্তি বলে, “আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু, লা শরীকা লাহু, ওয়া আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদান ‘আবদুহু, ওয়া রসূলুহু, রাযীতু বিল্লাহি রকযান ওয়াবিল ইসলামী ধীনান ওয়াবি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাবিয়্যান” তার গুনাহ মাফ করা হবে। কুতাইবাহ তার হাদীসে (‘আরবী) শব্দটি উল্লেখ করেননি। সহীহ মুসলিম, ৭৩৭

৪২ ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! মুআযযিন তো আমাদের ওপর মর্যাদার অধিকারী হয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : মুআযযিনরা যেরূপ বলে থাকে তোমরাও সেরূপ বলবে। অতঃপর ‘আযান শেষ হলে আল্লাহর নিকট দু‘আ করবে। তখন তোমাকে তা-ই দেওয়া হবে (তোমার দু‘আ কবুল হবে)। আবু দাউদ, ৫২৪



## দ্বিতীয় অধ্যায়

সালাতের প্রাণ হলো পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হওয়া। কেবল তাঁরই হান-খ্যেল অন্তরে পোষণ করা। সালাতে কিবলার দিক থেকে যেমন মুখ ফেরানো যায় না, তদ্রূপ সালাতে দাঁড়িয়ে গায়রুল্লাহ'র চিন্তাভাবনাও করা যাবে না। মুখ ও শরীরের কিবলা হলো কা'বা। আর রূহ ও কল্বের কিবলা হলেন রব্বের কা'বা (কা'বার রব)। বন্দা সালাতে আল্লাহর প্রতি যে পরিমাণ মনোযোগী হবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাও তার প্রতি ততটুকু মনোনিবেশ করবেন। যদি বন্দা আল্লাহর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তিনিও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন। যেমন কর্ম তেমন ফল।

### সালাতে মনোযোগের তিনটি ধাপ

সালাতে মনোযোগের তিনটি ধাপ রয়েছে :

১. প্রথম ধাপে বন্দা তার অন্তরকে একমাত্র আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট করে। ফলে এটি তার অন্তরকে নিরাপদ রাখে। নাফসের অসুস্থতা, শাইতানের প্ররোচনা এবং সালাতের জন্য ক্ষতিকর ও সাওয়াব বিনষ্টকারী সকল কাজ ও চিন্তা থেকে অন্তরকে রক্ষা করে।

২. এই ধাপে পৌঁছলে বন্দা আল্লাহর 'ইবাদাতে এমনভাবে মগ্ন হয়, যেন সালাতে সে আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছে।



তিন। তৃতীয় ধাপে পৌঁছা যায় যখন বান্দা কুর'আন তিলাওয়াতের সময় এর অর্থের প্রতি মনোযোগ দেয় এবং এর মর্ম উপলব্ধি করতে পারে; যখন সে 'ইবাদাতের বিভিন্ন দিকগুলোর রহস্য ভেদ করে, বিনয় এবং প্রশান্তির সাথে সেগুলো আদায় করে।

যদি কেউ এ তিনটি ধাপ সফলভাবে অতিক্রম করে, তার সালাত যথাযথভাবে আদায় হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। এর বিনিময়ে তখন সে আল্লাহর নিকট থেকেও পূর্ণ মনোযোগ লাভ করবে।

### সালাতের প্রতিটি কর্মে মনোযোগ বাড়ানোর উপায়

আল্লাহর সম্মুখে বান্দার বিনীতভাবে দণ্ডায়মান অবস্থা তখনই ফলপ্রসূ হয়, যখন তার পূর্ণ মনোযোগ কেবল আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ থাকে এবং সে ডানে বামে তাকানো থেকে নিজেকে বিরত রাখে।

■ যখন বান্দা সালাতে দাঁড়াবে, তখন ভাববে, সে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছে। তার পূর্ণ মনোযোগ আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট থাকবে। সে স্মরণ করবে মহান রবের মহানুভবতা ও বৈশিষ্ট্যের কথা—যা তাকে ডানে বামে তাকানো থেকে বিরত রাখবে।

■ যখন 'তাকবীর' বলবে, তার মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য, সম্মান ও 'ইযযাতের কথা স্মরণ করবে। ভরাট কণ্ঠে 'আল্লাহু আকবার' বলে সালাত শুরু করবে।

■ সানা পড়ার সময় তার তাসবীহ ও হামদের প্রতি মনোযোগী হবে, এবং ঘোষণা করবে—মানবীয় গুণাবলি, যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে তার সত্তা পবিত্র। তিনি তার সকল গুণে পূর্ণাঙ্গ।

■ যখন 'আ'উযুবিল্লাহ...' পড়বে, ভাববে আল্লাহর শক্তি ও শক্তিমত্তার কথা। তার নিরাপদ আশ্রয়ের কথা। শত্রু থেকে বান্দাকে রক্ষা করা এবং নিরাপত্তাদানের কথা।

■ যখন তিলাওয়াত করবে তখন সে যা তিলাওয়াত করছে তার অর্থের প্রতি মনোনিবেশ করবে এবং কালামুল্লাহ'র গভীরে এমনভাবে পরিভ্রমণ করবে যেন সে কালামুল্লাহর মধ্যে আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছে। কোনো এক ইমাম বলেছেন, 'কালামুল্লাহর মাঝে আল্লাহ তার বান্দার কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন।'

সালাতে খুশু-খুশুর ব্যাপারে, তিলাওয়াতের অর্থ ও মর্ম অনুধাবনে মানুষের স্তর ভিন্ন ভিন্ন। কেউ আছে কালামুল্লাহর অর্থ ও মর্ম পরিপূর্ণ বুঝে তার স্বাদ আস্বাদন করতে পারে; এ ব্যক্তির উদাহরণ দৃষ্টিসম্পন্ন পূর্ণ সুস্থ মানুষের মতো। কেউ আছে কালামুল্লাহর অর্থ ও মর্ম কিছু বোঝে, কিছু বোঝে না; এ ব্যক্তির উদাহরণ একচোখবিশিষ্ট মানুষের মতো। আবার কেউ মোটেও বুঝতে পারে না; তার উদাহরণ অন্ধ ব্যক্তির মতো।

সূতরাং কির'আতপাঠের সময় উচিত হলো—আল্লাহর সত্তা ও সিফাত, কথা ও কর্ম, আদেশ ও নিষেধ, ও'য়াদা ও ও'য়াদীদের (প্রতিশ্রুতি প্রদান ও ভীতিপ্রদর্শন) প্রতি খেয়াল রাখা, গভীর মনোযোগী হওয়া।

■ যখন রুকু' করবে, তখন প্রতিপালকের শান-শওকত, 'ইযযাত ও 'আজমাত (বড়ত্ব), মহিমা ও পূর্ণতার কথা মনে করবে। আর পড়বে 'সুবহানা রব্বিয়াল আযীম'।

■ অতঃপর যখন রুকু' থেকে সোজা হয়ে স্থিরতার সাথে দাঁড়াবে। তার হামদ, সানা ও তামজীদ করবে। যবানের সাথে হৃদয়কেও যুক্ত রাখবে এবং তার বন্দেগী, প্রতিদান ও সাজা দানের একক ক্ষমতার কথা স্মরণ করবে।

■ যখন বান্দা সিজদায় লুটিয়ে পড়বে, তখন সে কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নৈকট্যলাভে মনোযোগী হবে। নিজের শক্তিহীনতা, দুর্বলতা, অক্ষমতা ও অপারগতা তার সামনে ফুটিয়ে তুলবে। দাসের মতো নিজের অহমিকা ও অস্তিত্ব মিটিয়ে দেবে মহান রবের সামনে।

■ যখন সে সিজদা থেকে মাথা তুলে আসামীর মতো হাঁটু গেঁড়ে বসবে, তখন সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অমুখাপেক্ষিতা ও উদারতার কাছে নিজের মুখাপেক্ষিতা ও প্রয়োজনের কথা তুলে ধরবে। একাগ্রচিত্তে বিনয়াবনত হয়ে রাহমাত, মাগফিরাত, হিদায়াত, সুস্থতা ও রিয়ক চাইবে।

■ এরপর বৈঠক। এটি সালাতের সর্বশেষ অবস্থা ও 'ইবাদাত। যার দৃষ্টান্ত হলো হজের বিদায়ী তাওয়াফের মতো। সে তখন ভাবতে শুরু করে—তার সালাত পূর্ণাঙ্গ হওয়ার পথে এবং পূর্ণাঙ্গ হলেই তার এই শান্তি ও রাহমাতবেষ্টিত অবস্থা থেকে বের হয়ে তাকে পার্থিব বিভিন্ন ব্যস্ততা, অস্থিরতা ও যন্ত্রণায় ফিরে যেতে হবে, যে অবস্থায় সে সালাতে আসার পূর্ববর্তী সময়ে ছিল। সালাতের বেটনী থেকে বেরিয়ে



যেতে তার খারাপ লাগবে। একটা মৃদু যন্ত্রণা অনুভূত হবে তার হৃদয়ে। সে ভাববে, হায়, যদি কিয়ামাত পর্যন্ত সময়টা সালাতেই কাটিয়ে দেওয়া যেত!

■ সালাত আদায়কারী যখন সালাত শেষ করে, তখন সে আল্লাহর সাথে কথা বলা এবং সকল প্রকার সুখ ও সৌভাগ্যে ডুবে থাকা থেকে বেরিয়ে আসে। অভিশপ্ত দুনিয়ার দিকে ধাবিত হয়। এটা কেবল ওই ব্যক্তি-ই অনুধাবন করতে পারে, যার হৃদয় জাগ্রত। রব্বের কারীমের স্মরণ, মুহাব্বাত ও দয়ার বর্ষণে সিস্ত। যে নৃক্টির পিছনে ছোটা, তাদের সাথে ব্যস্ত থাকা এবং সময় অপচয় করার কন্ট ও দুর্ভোগ সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অবগত। আর যার বন্ধ সংকীর্ণ, ওই ব্যক্তি সালাতের দ্বান এবং সালাত থেকে বের হয়ে আসার মর্মব্যথা কখনো উপলব্ধি করতে পারবে না। তার অন্তর অন্ধকার। হৃদয় নির্জীব। সে অন্যায় পথে অগ্রসরমান। পাপাচারে নিমজ্জিত। পুণ্য তার কাছে বিবর্জিত। তার চিন্তা ও চিন্তা বহুমুখী।

### ‘ইসলাম’ শব্দ নিয়ে কিছু কথা

বান্দার প্রতি আল্লাহর দুই ধরনের নির্দেশ রয়েছে :

এক. আকীদা (বিশ্বাস)। অর্থাৎ, আমাদের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে, গ্রহে কিংবা ভিনগ্রহে যখন যা-কিছু ঘটে, সব আল্লাহর তত্ত্বাবধানেই হয়। তার শক্তিতেই হয়। দুনিয়ার সব নিয়ম ও শৃংখলায় রয়েছে তাঁর বিশেষ প্রজ্ঞা ও রূহুত। বুঝে আসুক বা না আসুক, এসব বিনাবাক্যে বিশ্বাস করা।

দুই. ‘ইবাদাত। যত প্রকার ‘ইবাদাত বান্দার ওপর আবশ্যিক রয়েছে, তা এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

এই উভয় আদেশের দাবি হলো, নিজের সত্তাকে আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়া। ‘তাসলীম’ (আত্মসমর্পণ) করা। ‘ইসলাম’ শব্দের উৎপত্তি মূলত এই ‘তাসলীম’ থেকেই। যখন বান্দা বিশ্বাস ও ‘ইবাদাতের কাছে নিজেকে অর্পণ করে, এর জন্য নিজের সময় ও সম্পদ ব্যয় করে, নাফস ও প্রবৃত্তিকে দমন করে এবং সমস্ত পাপ থেকে নিজেকে বিরত রাখে, তাকে বলা হয় মুসলিম। আত্মসমর্পণকারী।

## খুশু-খুযুর উপকারিতা

যখন সালাত আদায়কারীর অন্তর আল্লাহর স্মরণে, তিলাওয়াতে, যিক্রে ও ভালোবাসায় তৃপ্ত হয়, সে আল্লাহর 'ইবাদাত করাকে উপভোগ করে। তাঁর নৈকট্যলাভে ধন্য হয়। চক্ষু শীতল হয়। এগুলো ছাড়াও সে আরও দুটি নিয়ামত লাভ করে :

এক. 'ঈমানের নিরাপত্তা। অর্থাৎ, জাহান্নাম থেকে মুক্তি।

দুই. আল্লাহর অনুগ্রহ দ্বারা সৌভাগ্যশালী হওয়া। অর্থাৎ, জান্নাত পাওয়া।

আর মু'মিন বান্দার চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এ দুটিই। এই জীবন। এই সফলতা। এই সৌভাগ্য। পক্ষান্তরে, যখন কোনো ব্যক্তির হৃদয় 'নাফসে 'আম্মারা'র (মন্দ কর্মপ্রবণ অন্তর) আঘাতে দুর্বল হয়ে পড়ে, প্রবৃত্তি এবং বিতাড়িত শাইতান দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন তার 'ইবাদাত প্রাণহীন হয়ে পড়ে।

আল্লাহর অসীম করুণা যে, তিনি বান্দার জন্য সালাতকে ফরয করেছেন। তাতে যুক্ত করে দিয়েছেন আরও বহু 'ইবাদাত। যাতে বান্দার পাপ মোচন হয়। আত্মা পবিত্র হয়। 'ঈমান বৃদ্ধি পায়। সৎকাজে উদ্বুদ্ধ হয় এবং তিনি প্রত্যেক দুই সালাতের মাঝে রেখেছেন সময়ের বিস্তার ব্যবধান। এটি তার বিশেষ দয়া। যাতে অপবিত্র হৃদয়-মন বার বার ধৌত করা যায়। অবাধ্য নাফসকে 'ইবাদাতের বন্ধনে বেঁধে রাখা যায়। মধ্যবর্তী সময়ে যেসব পাপ-পঙ্কিলতা বান্দার হৃদয়ে লেগে যায়, তা বিদূরিত করা যায়।

তিনি নাফসের পরিশোধনের জন্য সালাতে অনেক রকমের 'ইবাদাত রেখে দিয়েছেন। প্রতিটি অঙ্গের পৃথক পৃথক 'ইবাদাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এসব তখনই পরিপক্ব ও গ্রহণযোগ্য হবে, যখন খুশু-খুযু ও একাগ্রতার সাথে সালাত আদায় করা হবে। এজন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 'ইবাদাতের ফল ও উপকারিতা রেখেছেন খুশু-খুযুর মাঝে। আর খুশু-খুযুকে করেছেন সাওয়াব ও নৈকট্যলাভের মাধ্যম। খুশু-খুযুর সাথে বান্দা যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'আমাল আল্লাহর কাছে পেশ করছে, কিয়ামাতের দিন তিনি তার সামনে তা বৃহৎ আকারে তুলে ধরবেন।



## সালাতের উপকারিতা/লক্ষ্য

প্রত্যেক কাজের একটি উদ্দেশ্য থাকে। একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। থাকে তার উপকারী দিকও। যেমন সিয়ামের উপকারিতা হলো নাফসের শুদ্ধি। যাকাতের উপকারিতা হলো সম্পদের পবিত্রতা। হজের উপকারিতা হলো ক্ষমা ও পাপমার্জনা। জিহাদের উপকারিতা হলো জীবনের বিনিময়ে জান্নাত লাভ করা। আর সালাতের উপকারিতা হলো—আল্লাহর দিকে মনোযোগী হওয়া, এবং এর মাধ্যমে নিজের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সুদৃষ্টি লাভ করা।

সালাতের প্রতিটি রুকনে রয়েছে তাঁর নৈকট্যলাভের বহু মাধ্যম। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেননি—রোজায় আমার চোখের শীতলতা, হজ ও 'উমরায় আমার চোখের শীতলতা কিংবা অন্য কোনো 'আমালে; বরং তিনি বলেছেন—

“

وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে সালাতে।<sup>[৪৩]</sup>

অর্থাৎ, সালাত আদায়ের মধ্যে। তিনি বলেননি যে—بِالصَّلَاةِ (সালাত আদায়ের দ্বারা)। এ থেকে বোঝা যায়—চোখের শীতলতা অর্জিত হয় সালাতে থাকা অবস্থায়। পক্ষান্তরে, 'সালাত আদায়ের দ্বারা' বলা হয়ে থাকলে, সালাত চলমান না থাকলেও চোখের শীতলতা অর্জিত হয়—এমনটি বোঝাত।

একারণেই, কষ্ট ও ক্লান্তির পর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হৃদয়ের প্রশান্তি চাইতেন তখন বিলাল রায়িয়াল্লাহু 'আনহুকে বলতেন—

“

يَا بِلَالُ، أَقِمِ الصَّلَاةَ أَرِحْنَا بِهَا

বিলাল, সালাত দ্বারা আমার অন্তরকে প্রশান্ত করো। ক্লান্তি থেকে মুক্তি দাও!<sup>[৪৪]</sup>

অর্থাৎ, 'আযান দাও। সালাত কায়েম করো। যাতে দুনিয়ার ব্যস্ততা থেকে একটু মুক্তি পাই। যেভাবে ক্লাস্ত মুসাফির বাড়ি পৌঁছার পর প্রিয়জনের সাক্ষাতে পথের কষ্ট, ধানি ও অবসাদ ভুলে যায় এবং এর দ্বারা শান্তি লাভ করে।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, তিনি—أَرْحٰتًا 'সালাত দ্বারা মুক্তি দাও' বলেছেন, أَرْحٰتًا 'সালাত থেকে মুক্তি দাও' বলেননি। কারণ, যাদের সালাতের প্রতি অনীহা, চক্ষুলাজ্জার কারণে সালাত আদায় করে, বাধ্য হয়ে মাসজিদে গমন করে; সে যতক্ষণ সালাতে থাকে ততক্ষণ তার অন্তর ছটফট করতে থাকে। তার ভেতরে অস্থিরতা কাজ করতে থাকে—কখন সালাত শেষ হবে! কখন সে মুক্তি পাবে! কোনোমতে সালাত শেষ হলেই যেন সে বাঁচে।

এসবের কারণ হলো—তার অন্তর দুনিয়ার ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। দুনিয়া তার প্রেমাল্পদ। আর সালাত এসবের প্রতিবন্ধক; বাধা। ফলে সে যতক্ষণ সালাত আদায় করে ততক্ষণ একটা যন্ত্রণার মধ্যে থাকে। সে সালাত আদায় করে, রুকু' করে, কুর'আন পাঠ করে; কিন্তু তার দৃষ্টি ডানে-বামে ঘোরে। তার অন্তর দুনিয়ার চিন্তায় ডুবে থাকে। তার সালাতে খুশু-খুযুর ছিটেফোঁটাও পাওয়া যায় না। সে কেবল এজন্যই সালাত আদায় করে যে, এটা তার ওপর ফরয। কোনোভাবে আদায় করতে পারলেই যেন সে বাঁচে। ফলে সে যাচ্ছেতাইভাবে সালাত আদায় করে। যবান যা বলে তার অন্তর তা থেকে যোজন যোজন দূরত্বে অবস্থান করে।

সুতরাং, এটি স্পষ্ট যে, খুশু-খুযুওয়ালা সালাত আর এহেন সালাতের মাঝে রয়েছে কিস্তির পার্থক্য।

### খুশু-খুযু বিহীন সালাতের উদাহরণ :

এমন ব্যক্তির জন্য সালাত হলো শাস্তি। অজ্ঞ-প্রতজ্ঞের জন্য শিকল। এতে ফরযিয়াত (আবশ্যিকতা) অবশ্য আদায় হবে। কিছু সাওয়াব সে পাবে। গুনাহ মাফ হবে, এবং প্রভুর রাহমাত ততটুকুই পাবে, যতটুকুর সে উপযুক্ত। তবে সালাতে যে ত্রুটিগুলো সে করেছে, তার জন্য একদিন সে কঠোরভাবে পাকড়াও হবে।

### খুশু-খুযু ওয়ালা সালাতের উদাহরণ :

এমন ব্যক্তির জন্য সালাত হলো ফুলের বাগানের মতো। আত্মার প্রশান্তি। চোখের শীতলতা। নাফস ও অজ্ঞ-প্রতজ্ঞের সুখ। সে সালাতে আল্লাহর নি'য়ামাতসমূহ



উপভোগ করে। তার সুদ আসাদন করে। এমন নি'য়ামাত—যা সর্বদাই নতুন। তারা সালাতের দ্বারা যা লাভ করার তা তো পা-ই, সাথে লাভ করে বিশেষ নৈকট্য ও মরাদ্দ।

### সালাতের অন্যতম পুরস্কার

দুনিয়ার বাদশাহগণ কারও ওপর সন্তুষ্ট হলে মোটা অংকের বকশিশ দেন। নৈকট্য দান করেন। যেমন জাদুকেরা ফিরা'আউনকে বলল—

قَالُوا لِيَرْغَبُنَا أَتَيْنَّا لَكَ لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ

যদি আমরা মূসার ওপর জয়ী হই, তাহলে আমাদের পুরস্কার দেওয়া হবে তোমার।

ফিরা'আউন বলল—

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ

হ্যাঁ, পুরস্কার তো অবশ্যই, বরং তোমরা আমার নৈকট্যলাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

সে নৈকট্যদানের ও'য়াদা করেছে, এবং একজন বাদশাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রজার জন্য এটিই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। সালাতের ব্যাপারটিও অনুরূপ; এটিও আল্লাহর নৈকট্যলাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। সালাত আদায় করতে এসে মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

### প্রথম দল

যারা এই দলের অন্তর্ভুক্ত তাদের দৃষ্টান্ত হলো ওই ব্যক্তির মতো, যে মনিবের বাড়িতে প্রবেশ করে; কিন্তু তার এবং মনিবের মাঝে পর্দা ও অন্তরায় থাকার কারণে সে মনিবের সাক্ষাৎলাভে ব্যর্থ হয়; খুব কাছে এসেও সে মনিবকে দেখতে পায় না। মনিবও তাকে দেখা দেন না। ফলে তার উদ্দেশ্য অপূর্ণ হয়ে যায়। তো এই পর্দা ও অন্তরায় হলো

৪৫ সূরা আশ-শূ'আরা, ২৬ : ৪১

৪৬ সূরা আশ-শূ'আরা, ২৬ : ৪২

প্রভৃতি ও শাহাওয়াত (কামবাসনা)। নাফসের অলসতা। আল্লাহর অবাধ্যতা। পাপ কাজের উত্তেজনা। এতে করে তার ও মনিবের মাঝে দূরত্ব বাড়ে। ফলে সে সালাত আদায় করে চক্ষুজ্জ্বল ভয়ে। এমন সালাতে প্রাণ থাকে না। ভয়-ভর এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকে না। যতক্ষণ সে সালাতে থাকে ততক্ষণ শুধু ছটফট করে।

### দ্বিতীয় দল

আর এই দলের দৃষ্টান্ত হলো ওই ব্যক্তির মতো, যে তার মনিবের ঘরে প্রবেশ করে। তাঁর দর্শন লাভ করে। চক্ষু শীতল হয়। একান্ত আলাপে মুগ্ধ হয়। মনিবের অন্তরে ভালোবাসার অবস্থানটা পাকাপোক্ত করে নেয়। আর মনিব তাকে মূল্যবান উপহার সামগ্রী প্রদান করেন। নৈকট্য দান করেন। সে ওই বাড়ি থেকে বের হতে চায় না; বরং আরও দীর্ঘ সময় সেখানে অবস্থান করতে চায়। আরও অনেক উপটোকন পেতে চায়। এমন ব্যক্তি সালাতে তৃপ্তি লাভ করে। অভাবনীয় সুাদ আস্বাদন করে। সর্বদা সে আল্লাহর হুকুম পালনে আনন্দিত, উদ্বেলিত, উচ্ছ্বসিত থাকে। যেন সে 'ইবাদাতে তার প্রতিপালককে দেখতে পায় এবং শুনতে পায়। সালাতে কুর'আন পাঠের সময় স্রষ্টা তার কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন। ফলে সালাত থেকে বেরিয়ে আসা তার জন্য অত্যাধিক কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

খুশু-খুশু অর্জনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই একমাত্র পথ প্রদর্শক ও সহায়ক। এতক্ষণ যা বললাম, এ তো প্রকৃত সালাতের সামান্য কিছু নমুনা এবং ইজ্জিত মাত্র।







## তৃতীয় অধ্যায়

### সালাত এবং গান-বাজনার মাঝে পার্থক্য

মানুষ সালাত ছেড়ে গান-বাদ্য-বাজনা নিয়ে পড়ে থাকে। তাতেই রাতদিন বিভোর থাকে। সালাত-নিয়ামের কোনো খবর তার থাকে না। আচ্ছা, তাদের কাছে আমার প্রশ্ন, এই যে সালাতের সুখ ও সুাদের কথা উল্লেখ করা হলো, তার সামান্য কিছুও কি তারা গান-বাজনার মধ্যে পায়? আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তাদের গান-বাদ্য কি এতটুকু ফুরসত কখনো দিয়েছে যে, প্রকৃত সালাতের একটু সুাদ তারা গ্রহণ করবে? আদতে সালাতে যে খুশবু ও সুাদ রয়েছে এরা তার এতটুকুও আঁচ করতে পারে না।

আমি দৃঢ়চিত্তে বলতে পারি, অলসতার সাথে তাদের সালাত আদায় করা অথবা গান শোনা-ই প্রকৃত সালাতের সুাদের প্রতিবন্ধক। তাদের কর্মগুলোই সালাতের মরমে পৌঁছাতে বাধা দেয়। যদি আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কা না থাকত, তাহলে এসবের তিক্ত সুাদের বর্ণনা কিছুটা তুলে ধরতাম।

তবু যারা বুদ্ধিমান, সচেতন কিংবা সামান্য বিবেক-বুদ্ধি রাখে, তাদের কাছে এর পরিণাম অস্পষ্ট নয়। শ্রুটার দরবারে দাঁড়ানো এবং গানের মঞ্চে দাঁড়ানো; কুর'আন তিলাওয়াতের সুাদ এবং কবিতা আবৃত্তির সুাদ; কল্যাণের দিকে উৎসাহ

দানকারী এবং গুনাহর কাজে উদ্বুদ্ধকারীর মাঝে পার্থক্যগুলো সুস্পষ্ট। এক অন্তরে বিপরীতমুখী এই দুই বস্তু উপস্থিত থাকবে, তা হতে পারে না। যেমন একই ব্যক্তির অধীনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মেয়ে এবং আল্লাহর দূশমনের মেয়ে একত্র হতে পারে না।<sup>[৪৭]</sup>



৪৭ মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, ‘আলী ইবনু আবী তালিব রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু নাবী-তনয়া ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু ‘আনহা-কে ঘরে রেখেই আবু জাহলের কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু ‘আনহা যখন এ খবর শুনলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, লোকেরা বলাবলি করে, আপনি আপনার কন্যাদের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যাপারে রাগ প্রকাশ করেন না। অথচ ‘আলী রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু আবু জাহলের কন্যাকে বিবাহ করতে যাচ্ছেন। মিসওয়ার রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, তখন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়ালেন। আমি শুনলাম, তিনি তশাহহুদ পাঠ করে বললেন, আমি তো আবুল ‘আস ইবনু রাবী’র নিকটও আমার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি, সে আমাকে যা বলেছে তা বাস্তবে পরিণত করেছে। আর ফাতিমা আমারই একটি টুকরা, আমি অপছন্দ করি যে, কেউ তাকে ফিতনায় ফেলুক। আল্লাহর শপথ! আল্লাহর রাসূলের মেয়ে ও আল্লাহর শত্রুর মেয়ে কোনো লোকের নিকট কক্ষনো একত্র হতে পারে না। মিসওয়ার রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, এরপর ‘আলী রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যার করেন। **সহীহ মুসলিম, ৬২০৪**





## চতুর্থ অধ্যায়

### সাহাবীগণ ও পরবর্তীদের রুচিবোধ

এমন অন্তরে সুস্থ রুচিবোধ কী করে আসবে, যে ব্যক্তি সূন্নাহের পথ অর্থাৎ, যে পথ ও মতের ওপর সাহাবী ও তাবেরীগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তা থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছেন।

সাহাবী ও তাবেরীগণ সর্বদা আল্লাহর রাসূলের দেখানো পথেই চলেছেন। নববী আদর্শ জীবন সাজিয়েছেন। ফলে সিয়ামে, হজে, সালাতে, তিলাওয়াতে, কুর'আনের মর্ম ও গভীরতা অনুধাবনে, 'ইলমের জন্য দূর-দূরান্তে সফরে, জিহাদে জীবন বিলিয়ে দিতে, সংকাজে আদেশ ও অসংকাজে বাধা প্রদানে, কাউকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসায়, আবার তাঁর জন্যই ঘৃণা করার মাধ্যমে তৃপ্তি লাভ করতেন; কিন্তু পরবর্তীদের অনন্ত ও তৃপ্তির মাধ্যম হয়ে উঠল ঢোল-তবলা, গান-বাজনা, নর্তকীদের নৃত্য, শোরগোল ও করতালি, আল্লাহর অবাধ্যতা এবং নাফসের দাসত্ব। ফলে উভয় রুচিবোধ বা মনোমাবো আকাশ-পাতাল ব্যবধান গড়ে উঠেছে।

বস্ত্রুত, আবৃত্তি এবং তিলাওয়াতের স্বাদ; গানের আওয়াজ এবং সুরা মু'মিন, সুরা নূরের স্বাদ; বাঁশির সুর এবং সুরা যুমারের স্বাদ; রাখালের উদাসী বাঁশির টান এবং সুরা কমারের স্বাদ; শিস দেওয়া এবং সুরা ইয়াসীন ও সাফহাতের স্বাদ; তুড়ি-করতালি এবং সুরা আশ্বিয়ার স্বাদ; আবেদনময়ী রসালো কোনো

গল্প-উপন্যাস এবং সূরা ইউনুস ও হুদের ঘটনাবলির স্মৃতি; শাইতানের আনুগত্য এবং রাহমানের আনুগত্যের স্মৃতি; একই গান বার বার শোনার তিক্ততা এবং বার বার সূরা ফাতিহাপাঠ ও কুর'আনের মনোযোগী শ্রোতার স্মৃতি; ইবলীসের তরঙ্গে নিমজ্জিত হওয়া এবং দয়াময়ের সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর স্মৃতি; এসব একটা অপরটার সম্পূর্ণ বিপরীত আর কখনোই এগুলো এক হতে পারে না।

এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্মৃতি আসাদনকারীদের মাঝে ভাগ করে দিয়েছেন। সুখরুচি থেকে অসুখ রুচিকে আলাদা করেছেন। তবে আল্লাহ বড় দয়াময়, তিনি কাউকে তৎক্ষণাৎ পাকড়াও করেন না। সুযোগ দেন। অবকাশ দেন। এদেরকেও নি'য়ামাত দেন, ওদেরকেও দেন; তবে কিয়ামাত দিবসে উভয় দলকে পৃথক করে দিবেন।

আল্লাহর কসম! গানের প্রতি অনুরাগ এবং কুর'আনের প্রতি ভালোবাসা কখনো এক অন্তরে একত্র হতে পারে না। যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কন্যা এবং আল্লাহর দুশমনের কন্যা এক পুরুষের অধীনে একত্র হতে পারে না। কবির ভাষায়—

أنت القاتل بكل من احبته  
فاختر لنفسك في الهوى من تصطفى

ভালোবাসায় তুমি তো মরবেই, তো বেছে নাও নিজের জন্য, কাকে তুমি ভালোবাসবে?

### সাহাবীগণের শ্রবণ

সাহাবীগণ যখন একত্র হতেন এবং তাদের অন্তরকে প্রশমিত করতে চাইতেন, তাদের মধ্য থেকে একজনকে কুর'আন তিলাওয়াত করার আহ্বান জানাতেন, আর অন্যরা গভীর মনোযোগ দিয়ে তা শ্রবণ করতেন। এভাবে তারা প্রশান্তিতে বিমোহিত হতেন। তাদের চক্ষু হতে অশ্রু প্রবাহিত হতো এবং তাদের হৃদয় 'ঈমানের মিষ্টতা উপভোগ করত। এটা এমন এক অভিজ্ঞতা যা গান শ্রবণকারীরা কখনো তাদের কল্পনায়ও উপলব্ধি করতে পারবে না।

'উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু 'আনহুর নিকট যখন আবু মুসা আশ'আরী রাযিয়াল্লাহু 'আনহু আসতেন, তখন তিনি বলতেন—



“

ভাই আবু মূসা, আল্লাহর আলোচনা করো।’ আবু মূসা আশ‘আরী রায়িয়াল্লাহু  
‘আনহু তখন কুর’আন পাঠ শুরু করতেন। এতই মধুর ছিল তার তিলাওয়াত যে,  
তা প্রত্যেকের অন্তর ছুঁয়ে যেত।<sup>[৪৮]</sup>

তিলাওয়াত শুনে উসমান ইবনু ‘আফফান রায়িয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন—

“

যদি আমাদের অন্তর পবিত্র হতো, তাহলে কুর’আনের সুাদ কখনো নিঃশেষ হতো না।<sup>[৪৯]</sup>

হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! যে সত্তার নিকট বান্দার সুপ্ন, ভালোবাসা ও আকাঙ্ক্ষার  
আবাসস্থল, তাঁর কথামালার সুাদ কীভাবে নিঃশেষ হতে পারে! এ তো এমন  
বাক্যমালা, যার সাথে কোনো সুর-লহরী ও গানের তুলনা চলে না।

কবি বলেন—

واذا مرضنا تداوينا بذكركم  
فان تركناه زاد السقم والمرض

আগ্নি অসুস্থ হলে তোমার যিক্র দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করি। এখন তোমার  
যিক্রই যদি ছেড়ে দিই, তবে তো অসুস্থতা বেড়ে যাবে!

গানে আসক্ত ব্যক্তির এসব থেকে বঞ্চিত। তাদের বসতি এক উপত্যকায় হলে,  
অন্যদের বসতি আরেক উপত্যকায়।

কবির ভাষায়—

والضرب والنون قد يرجى إلتقائه  
وليس يرجى إلتقاء الوحى والقصب

ডাঙার গুঁইসাপ ও জলের মাছ একসাথে মিলতে পারে, কিন্তু ওহীর সুর ও  
বাঁশির সুর কখনো একত্র হতে পারে না।

৪৮ মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, ৪১৭৯

৪৯ ফায়াইলুস সাহাবা

কোথায় একই কাব্য বার বার শোনা এবং সুর ও বাদ্যের তালে তালে উল্লসিত হওয়া, আর কোথায় আল্লাহর কুর'আন পড়ে 'ঈমানের জোশে উদ্বেলিত হওয়া? হৃদয়ের অস্তিত্বই তো কুর'আন বোঝার জন্য। আর কুর'আনের অবতারণাই হলো আঁধার কালো অন্তরে আলোর প্রজ্জ্বলন এবং খরা-শুষ্ক হৃদয় সঞ্জীবনী সুধা বর্ষণের জন্য।

সুতরাং যখন কেউ মধুর সুরে সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করে...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طه

مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى

إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى

تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

وَإِنْ يُجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। ত-হা। তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি তোমার প্রতি কুর'আন অবতীর্ণ করিনি; বরং তা আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য সতর্কবাণী হিসেবে অবতীর্ণ করেছি—যিনি পৃথিবী ও সুউচ্চ আকাশ সৃষ্টি করেছেন, এই কুর'আন তাঁর নিকট হতে অবতীর্ণ হয়েছে। দয়াময় আল্লাহ্ 'আরশে সমুন্নত আছেন। যা আকাশসমূহে আছে, যা যমীনে আছে, যা এ দুয়ের মাঝে আছে আর যা ভূগর্ভে আছে—সব তাঁরই। যদি তুমি উচ্চকণ্ঠে কথা বল,—তাহলে জেনে রেখো—তিনি গোপন ও তদপেক্ষাও গোপন বিষয়ও জানেন।<sup>[৫০]</sup>

এতো কেবল ওই ব্যক্তিই উপলব্ধি করতে পারে যার হৃদয় জাগ্রত। যার অন্তর সূচ্ছ। যে প্রভুর ভালোবাসা উপলব্ধি করতে পারে, তার মিস্ততা আস্বাদন করতে পারে। এমন ব্যক্তির হৃদয়ই কেবল কুর'আন তিলাওয়াতে তৃপ্ত হয়। চক্ষু শীতল হয়। অন্তর বিগলিত হয়। মন প্রশান্ত হয়। তার অবস্থা হলো এমন, যেন বহু প্রতীক্ষার পর



প্রিয়তমের সাক্ষাৎ পেয়েছে। তীব্র তৃষ্ণার পর ঠান্ডা পানির প্রস্রবণ মিলেছে। এমন ভূমির ব্যাপারে তোমার কী ধারণা—যা শুষ্ক অনুর্বর; পানিশূন্যতায় যার মাটি ফেটে চৌচির। পানির দিকে সে জমি কেমন মুখাপেক্ষী?

অতঃপর যখন বর্ষা নামে, ভূমি তখন তার প্রাণ ফিরে পায়। ফলে সেখানে ঘাস ও ফসল উৎপন্ন হয়। সতেজ ও সজীবতায় চারদিক ভরে ওঠে। নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে তার দৃশ্য। এই জমি হলো হৃদয় আর বৃষ্টি হলো তিলাওয়াত।

এই বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে তার ফেরেশতা, তার নাবী-রাসুল ও সালিহীনদের যে পদ-মর্যাদা এবং কুর'আন থেকে তাদের লব্ধ যে অভিজ্ঞতা, গান শ্রবণকারীদের পদ-মর্যাদা এবং অভিজ্ঞতা কোনোভাবেই তার সমকক্ষ হবে না। এর কারণ, গানে আসক্ত ব্যক্তি হলো নাফসের গোলাম। প্রবৃত্তির পূজারী। মন যা চায়—সে তা-ই করে। এই সামান্য পার্থক্যটুকুও যারা করতে পারে না। তারা যেন আল্লাহর নিকট এই প্রার্থনা করে—যাতে আল্লাহ তাদের সুস্থ রুচিবোধ দান করেন এবং তাদের নির্জীব অন্তরে প্রাণের সঞ্চার করেন। অজ্ঞতা ও পঙ্কিলতা বিদূরিত করে হিদায়াতের আলো প্রজ্জ্বলন করেন। আর এমন এক বিবেক দান করেন, যার দ্বারা সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করা যায়। নিশ্চয় আল্লাহ অতি নিকটে। তিনি বান্দার প্রার্থনা কবুল করেন।





## পঞ্চম অধ্যায়

### গান-বাজনার সূক্ষ্ম একটা বিষয়

গানের ক্ষতিকর অনেক দিক রয়েছে। তন্মধ্যে সূক্ষ্ম ও মারাত্মক একটা দিক আছে, যা কেবল সচেতন ব্যক্তিরাই বুঝতে পারে। যেমন : কোনো গানে যখন আল্লাহর প্রশংসা থাকে, তার একত্ববাদের (তাওহীদের) কথা থাকে, তখন কিছু মানুষ তা শোনা বৈধ মনে করে। সেসব আসরে যোগদান করে। ফলে হয়তো অন্তর সাময়িক তৃপ্ত হয়, ভেতরটা আন্দোলিত হয়; কিন্তু আসর ভাঙার পর ক্রমেই শুরু হয় অস্থিরতা, দুষ্টিতা, হীনম্মন্যতা। ফলে বহু মানুষের মাঝেও নিজেকে মনে হয় বড্ড একা।

এই অনুভূতিটুকু কেবল সে-ই অনুভব করতে পারে, যার হৃদয়ে হিদায়াত ও রাহমাতের প্রাণ আছে। আল্লাহ্‌ভীতির কিঞ্চিৎ নূর আছে। আর যার এতটুকুও বোধশক্তি নেই, সে তো মৃত। শত আঘাতেও তার কী আসে যায়! আল্লাহ্র শপথ! আজ এমন মৃত হৃদয়ের অভাব নেই। যদি তাকে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে সে কিছুই বলতে পারে না। বলবে কী করে, সে তো আপাদমস্তক পাপের সাগরে নিমজ্জিত। অন্তরের সামান্য ব্যথাও সে অনুভব করে না! অন্তর জীবিত না মৃত—তাও সে জানে না! যেদিন বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াবে, সেদিন সে বুঝবে, এতদিন সে কীসে বিভোর ছিল!



প্রিয় ভাই, কেন এই হঠাৎ খারাপ লাগা? কেন এই হীনম্মন্যতা, দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা? আমি কারণগুলো বলছি, আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আসলে গান-বাজনার মূলেই রয়েছে সমস্যা। যখন তাতে ইসলামী কথাবার্তা যোগ হয়, তখন শ্রোতা ভাবে—এটা বৈধ। অথচ এটা সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত। প্রবৃত্তির লালসা দিয়ে ভরপুর। গানের একটা দিক প্রশংসিত হলেও, মূলত তা নাফস ও শাইতানের কর্ম দ্বারা রঞ্জিত, অপবিত্র, অশুদ্ধ। এতে বিবেকের যে অংশটা প্রভুর পক্ষে, তা মিশে যায় বিবেকের মন্দ অংশের সাথে। ফলে এক সময় মন্দ কাজটা বিবেকের যুক্তির কাছে ভালো মনে হয়। আর খারাপ হয়ে যায় নেকির কাজসমূহ।

এ ধরনের গান শোনা মানে সূচ্ছ পানিকে ঘোলা পানির সাথে প্রবাহিত করা। অপবিত্র বস্তুকে পবিত্র বস্তুর ওপর প্রাধান্য দেওয়া। এই গান শোনাটাই বিশুদ্ধ আকীদা ও বিশুদ্ধ ‘আমালের প্রতিবন্ধক। যতক্ষণ সে গান বাজনায়ে নিমজ্জিত থাকে, ক্ষতিকর দিকটা তার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না। এরপর যখন ঘোর ভাঙে, আনন্দ ফুরিয়ে যায় এবং নেশাগ্রস্ততা থেকে সে বেরিয়ে আসে, তার নিকট রয়ে যায় পাপের কর্দমাক্ত পঙ্কিলতা, রয়ে যায় শাইতানের খারাপ প্রভাব। এগুলোর কারণেই নতুন করে শুরু হয় অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা।

এর উপমা হিসেবে এমন ব্যক্তির কথা চিন্তা করুন, যে তার প্রিয়তমার দর্শনে নিমগ্ন এবং পূর্ণ মনোযোগ কেবল তার প্রতিই নিবিষ্ট, কিংবা এমন কোনো ব্যক্তি যে আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এরূপ ব্যক্তির ওপর প্রেম কিংবা হতবিস্ময়তা এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে যে, তার অনুভূতিশক্তি লোপ পায়। এ অবস্থায় যদি তাকে ডাকা হয়, আঘাত করা হয় অথবা কষ্টদায়ক কিছু এসে তার শরীরে পড়েও, তবুও সে তা টের পায় না, উপলব্ধিতে আনতে পারে না; কিন্তু যখনই সেই অবস্থার রেশ কেটে যায়, অনুভূতিশক্তি ফিরে আসে, তখন তার আঘাত অনুভূত হওয়া শুরু হয়।

সেজন্য এ ঘোর কেটে যাওয়ার সাথে সাথে বিশ্বাসীগণের মধ্যে যারা সচেতন এবং সফলতাকামী, তারা তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর এই রোগের কারণগুলো খুঁজে খুঁজে দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণ করে। এটা খুব সহজ নয়। তবে যারা আত্মশুদ্ধির প্রতি আগ্রহী তারা নিজের আত্মিক রোগ ও তার কারণসমূহ জেনে সে অনুপাতে চিকিৎসা নিতে পারে, তাদের জন্য এটা তেমন কঠিনও নয়।

কোনো সন্দেহ নেই, গান-বাজনার মধ্যে তাওহীদ, হামদ ও ইসলামবিষয়ক কথা থাকলে তাতে একধরনের তৃপ্তি লাভ হয়; কিন্তু সেটা হলো নাপাক পাত্রের মধু

খাওয়ার মতো। যাদের হৃদয় পবিত্র, 'ঈমানের আলোয় উদ্ভাসিত, তারা নোংরা পাত্রে পান করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। যাতে অপবিত্রতা তাকে স্পর্শ না করে। সে যখনই পান করে, পবিত্র পাত্রে পান করে। পাত্র না পেলে অপেক্ষা করে।

যারা গানের মাঝে ইসলাম খোঁজে, তাদের অবস্থা এমন যে, তারা যেকোনো পাত্রেই পান করে। পিপাসা নিবারণ করে। হোক সেটা মৃতপ্রাণীর হাড়ি, কুকুর, বা শূয়োরের চামড়া থেকে তৈরি কোনো পাত্র, কিংবা মদের পেয়ালা, যাতে মদ লেগে আছে। বস্তুত তারা ওই সকল কাকের মতো, যারা সূচ্ছ পানি পান করে, আবার নর্দমায়ও মুখ দেয়। এতে তার কিছুই আসে যায় না। পান করার দ্বারা তার তৃষ্ণা নিবারণ হয় ঠিকই, কিন্তু মুখে দুর্গন্ধ লেগে থাকে।

কিছু মানুষ আছে যারা মিথ্যা, বানোয়াট ও অর্থহীন সব কাব্য ও গান শুনে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। তারা মূলত নোংরা পাত্রে নাপাক পানি পান করে। প্রবৃত্তির দাস এরা। ভালো-মন্দ পার্থক্য করার অনুভূতিটুকুও তাদের নেই। অন্যদিকে, কিছু মানুষ আছে যারা নেককার। তারা শুধু কুর'আন পড়ে। কুর'আন শোনে। তারা পবিত্র পাত্রে অমিয় সুধা পানকারী।

**পাত্র এবং পানীয় উভয়টি তিন প্রকারের :**

১. পবিত্র
২. অপবিত্র
৩. মিশ্রিত

### অন্তরের প্রকার

অন্তর বা হৃদয় তিন প্রকার।

এক. সুস্থ ও পবিত্র। এদের পাত্র পবিত্র, পানীয়ও পবিত্র।

দুই. রুগ্ন ও অসুস্থ। এদের পাত্র নোংরা, পানীয়ও নোংরা।

তিন. পাক-নাপাক মিশ্রিত। এমন অন্তরে বিশ্বাস এবং মুনাফিকী উভয়টি বিদ্যমান থাকে। ফলে এরা পবিত্র এবং অপবিত্র উভয় পাত্র থেকেই পান করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রত্যেকের জন্য উপযুক্ত প্রতিদান রেখেছেন।



যারা ফকীহ, বিদ্বান 'আলিম, তারা সকল বিষয়ে গভীর নজর দেন। চিন্তা করেন এবং এর পরিণতি ও পরিণাম নিয়ে গবেষণা করেন। যদি তারা বুঝতে পারেন যে, কোনোকিছু মানুষকে হারাম কাজে ধাবিত করে, তখন সেটাকে তারা হারাম বলে সাব্যস্ত করেন। যেমন নারীর সাথে অবাধ মেলামেশা করা, ব্যভিচার করা হারাম। তদ্রূপ বেগানা নারীর দিকে তাকানো, তার সাথে আলাপ করা, নির্জনে মিলিত হওয়াও হারাম।

মোটকথা, শারী'আতে নিষিদ্ধ কাজ দু'প্রকার।

এক. মূল কাজটাই হারাম।


দুই. যা কিছু হারামের দিকে টেনে নিয়ে যায়, সেটাও হারাম। অনেকেই হারামটা দেখে। বোঝে। হারাম থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করে; কিন্তু হারামের সহায়ক কাজও যে হারাম, সেদিকে অনেকেই ভ্রমক্ষেপ করে না। আল্লাহ্ আমাদের হিফাযত করুন। আমীন।



“

সেসকল মুমিনরা সফল হয়েছে যারা নিজেদের  
সালাতে বিনয়ী।

[সূরা মুমিনুন, আয়াত : ০১-০২]

 অমরতালী প্রকাশন



সালাতে দাঁড়ালেই কেমন যেন উথালপাথাল করে মন। বিক্ষিপ্ত ভাবনায়, বিচ্ছিন্ন চিন্তায় আবদ্ধ হয় মনোযোগের সমস্ত আয়োজনা কেন যেন সালাতে দাঁড়ালেই আমরা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ি। যে মহান বাদশাহর দরবারে হাত পাতব বলে জায়নামাজ বিছাই, খানিক বাদে সেই জায়নামাজ মুখরিত হয় আমাদের অন্তরের সব অবাস্তব কলরবো যার কাছে নত করি শির, সেই শির যদি ডুবে থাকে দুনিয়াবি মগ্নতায়, করুণা লাভের প্রত্যাশা সেখানে অলীক স্বপ্নের নামান্তর মাত্র।

বৃক্ষের সঞ্জীবনী শক্তি এবং জমির উর্বরা শক্তির মতো আমাদের সালাতেরও প্রয়োজন পর্যাপ্ত প্রাণশক্তি। সূর্য যেমন উদ্ভিদে খাদ্যের জোগান দেয়, বৃষ্টিকণা যেভাবে মাটিতে সজীবতা ছড়িয়ে দেয়, অক্সিজেন যেমন করে দেহের মাঝে বইয়ে দেয় প্রাণের স্ফুরণ, ঠিক সেভাবে সালাতকে জীবন্ত করে তুলতে প্রয়োজন হৃদয়ের একান্ত আকুতি। সেই আকুতির খোঁজে, অন্তরের সেই সঞ্জীবনী শক্তির সন্ধানে আমাদের এবারের নিবেদন ‘খুশুখুযু’।



সমকালীন প্রকাশন